# অমৃতস্য পুত্রাঃ

( উপন্যাস )

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# প্রথম অধ্যায়

জনপূর্ণ পৃথিবীতে জনতাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও অনেকগুলি মানুষ মিলিয়া একসঙ্গে জমাট বাঁধিবার আর নিশ্বাস, গায়ের গন্ধ, সংক্রামক রোগ, কড়া কথা, এই সব আদান-প্রদান করিবার সাধ মানুষের কেন থাকিবে, সে কথাটা যারা ঘরের কোণায় বসিয়া ছাপান কাগজের পাতা হইতে ঠু'খোচ দিয়া জ্ঞান শুষিয়া শুষিয়া হয় মানবতত্ত্ববিদ্, তাদের বিবেচ্য। পিঁপড়াও ভিড় জমায়, কেবল গুড়ের চারিদিকে নয়, সকলে মিলিয়া সকলের চেষ্টায় যাতে সকলে বাঁচিতে পারে, সেইজন্য। পাখা ওঠার পর একা একা পাখায় ভর দিয়া পিঁপড়া তাই স্বর্গে যায়।

যেখানে যত বেশী মানুষ যত বেশী জমাট বাঁধে আর প্রত্যেক দিন যত বেশী উপলক্ষে যত বেশী জনতা হইয়া আসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, সেখানটা তত বড় সহর। স্কুল কলেজে ক্লাস বসে রোজ, দশটায় খোলে আপিস,

সভা-সমিতির অধিবেশন হয় হরদম, খেলার মাঠে দশ বিশ পঁচিশ রকমের খেলা বাদ যায় না একদিনও, প্রত্যেকটি সিনামায় প্রত্যেকদিন একটি প্রবেশ-পত্র কিনিতে চায় দশজনে, রেস্তোরাঁয় চা-চপ খায় সকলে, কাফে-ডি-অমুকে দু'একটা ভঙ্গুর বোতলের অবাস্তবতার স্বর্গে উঠিয়া প্যাডোচ্চ-মধ্যা সমতল-বক্ষা উর্ব্বশীর সঙ্গে নাচে অনেকেই, বাজারে চলিতে থাকে আলু-পটল বিক্রি, দাওয়ায় বা বাহিরের ঘরে চলিতে থাকে আড্ডা, অন্তঃপুরে একটা মানুষের দশভাগের একভাগ থাকিতে পারে যে স্থানটুকুতে সেখানে বাস করে দশজন—

দশজনের একজনও পুরা মানুষ নয়, তাই রক্ষা।

হয়ত মানুষ নয়।

অনুপম আর শঙ্কর দু'জনেই কলেজ যাইতেছিল। অনুপম যাইতেছিল বাসে আর শঙ্কর যাইতেছিল বাড়ার মোটরে। একটা প্রকৃত ও প্রকাণ্ড চৌমাথায়, চারিদিকের চারটি পথবাহী গাড়াঘোড়া ও মানুষের দ্রুতগতির মধ্যেই যেখানে প্রগতির লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, আর যেখানে কাগজ ফেরিওয়ালাদের বগলে দু'চার পয়সা দামের সংবাদরূপী বিশ্বকে কিনিতে পাওয়া যায় দু'চার পয়সা দাম দিয়া, সেই চৌমাথায় লাল আলোর ইঙ্গিতে বাস আর মোটরটি পাশাপাশি থামিয়া গেল।

প্রকাণ্ড দোতলা বাস, বসিবার আসনগুলি বাদ দিলে একটি পরিবারের চমৎকার বাস-গৃহ হইতে পারে। অনুপম কোণে

বসে নাই, নীচের তলায় মাঝখানের একটি আসনে কোণঠাসা অবস্থায় জানালা দিয়া চাহিয়াছিল পথের দিকে। মোটরটির পিছনের সিটে ট্রাউজার-ঢাকা দুই হাঁটুর উপর কনুই আর কামান গালে হাতের তালু রাখিয়া বসিয়া ছিল শঙ্কর আর তার পাশে বসিয়াছিলেন তার সাড়ে তিয়াত্তর বছরের ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর।

কয়েক হাত তফাতে বাসের জানালায় অনুপমের মুখখানি দেখিয়া ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর চিনিতে পারিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, অনুপম না ? ও অনুপম !

চোখোচোখি হইয়াছিল কয়েক সেকেণ্ড আগেই। বাসের জনতায় অজ্ঞাতবাসী অনুপম মানুষ চেনার ব্যাপারে একটু কাঁচা, এতগুলি মানুষের মধ্যে এতক্ষণ সে যে নিজেকে স্বতন্ত্র, একা, অসহায় আর ছেলেমানুষ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে চেনা জগতের কাছে অজ্ঞাতবাসীর নিজেকে অচেনা করিয়া রাখার মত, নিজের মনের সুপরিচিত অংশটুকুর কাছে নিজেকে অপরিচিত করিয়া তুলিতেছিল, বছর তিনেক আগে দেখা একজন বুড়োকে এতকাল পরে চোখে দেখামাত্র মনে পড়ার মানসিক প্রক্রিয়াটিকে সে ভাবনা একটুও প্রশ্রয় দেয় না।

অনুপম বলিল, আপনি কে ?

বীরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে নেমে আয়, তারপর বলছি আমি কে। নাম, নাম, শীগ্‌গির নাম।

জীবনে আর কখনও তো এমন ঘটনা ঘটে নাই। এমন দামী মোটরের আরোহী, ধূসর রঙের দামী কাপড়ে তৈরী চাপ-

কানের মত লম্বা এরকম কোট গায়ে সাদা গোঁপ-দাড়িতে এরকম ঋষির মত মুখওয়ালা, এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ জীবনে আর কবে অনুপমকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাস হইতে নামিতে বলিয়াছে ? যানবাহনের গতি-নিয়ামক যন্ত্রের লাল আলো এতক্ষণে নীল রঙে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়ায় বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনুপম নামিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। মানুষ ঠেলিয়া বাস হইতে নামিবার অভ্যাস তার অনেক দিনের, তবু, মোড়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছানোর আগে মাটিতে পা দেওয়া সেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিল না। হাতে বই, মুখে ব্রণ, কালো একটি মেয়ের কাছে মাথা তার কাটা গিয়াছে লজ্জায়, পা মাড়াইয়া দেওয়ায় একজন প্রৌঢ়বয়সী ভদ্রলোক ছোটলোকের মত কি যেন বলিয়াছেন অপমানকর, বাস হইতে নামার জন্য বীরেশ্বরের হুকুমের অজানা রহস্য মনের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে আরও গভীর, তবু বাসের টিকিটের পয়সাকটা নষ্ট হওয়ার কথাটাই যেন খচ খচ বিঁধিতে লাগিল অনুপমের মনে। আবার টিকিট করিতে হইবে। আবার দিতে হইবে চার চারটা পয়সা।

মোটর গাড়ীটি বাসের পিছু পিছু আগাইয়া আসিয়াছিল, পাশে থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের কুড়ি-বাইশটা গাড়ীর হর্ণে বাজিয়া উঠিল বিরক্তির আওয়াজ।

বীরেশ্বর বলিলেন, আয় অনুপম, ভেতরে আয়।

অনুপম ভিতরে গিয়া বসিল। চেনা মানুষ সন্দেহ নাই,

কিন্তু চেনা যায় না কেন ? এতক্ষণ এটা খেয়াল থাকে নাই, এবার পাশে বসিয়া বীরেশ্বরের গোঁপ-দাড়িতে ঢাকা মুখখানায় অপরিচয়ের আবরণ সরাইতে না পারিয়া হঠাৎ লজ্জায় অনুপম একেবারে যেন কাবু হইয়া গেল

চেনা মানুষকে না চিনিতে পারার লজ্জা। প্রণম্যকে প্রণাম করার বদলে মনের ভুলে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দেওয়ার মত এ যেন একটা সাংঘাতিক অপরাধ।

বীরেশ্বর বলিলেন, আমি চিনলাম, তুই আমাকে চিনতে পারলি না অনু ? আজকালকার ছেলে তোরা, তোদের কাণ্ডই আলাদা। মনের মধ্যে হাজার রকম চিন্তা আর স্মৃতির খিচুড়ি পাকাস, একটাও স্পষ্ট হতে পারে না। আমি হলাম তোর ঠাকুর্দ্দা।

. একটু হাসিলেন বীরেশ্বর, অত দাড়ি-গোঁপের জঙ্গলেও হাসিটা দেখা গেল। হঠাৎ খুসি হইয়া অনুপম বলিল, চিনেছি।

কে বলত' আমি ?

আপনি সীতা-পিসীমার বাবা।

তোর বাবার বাবা নই ?

এটা পরিহাস। নিজের কথায় বীরেশ্বর নিজেই হাসিলেন, কিন্তু অনুপমের অত সহজে হাসি আসে না। মনের মধ্যে হাসির যে কারখানা আছে সেটার অনেকগুলি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, মনটাও কি হইয়া যায় নাই গোলকধাঁধাঁর মত এলোমেলো রকমের বাঁকা ? সংক্ষেপে সে শুধু বলিল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ? শুধু হ্যাঁ? আমি হলাম তোর ঠাকুর্দা, শুধু হ্যাঁ বলে আমার কথার জবাব দিলে পাপ হয়।—এ তোর রাম-লাল কাকার ছেলে শঙ্কর। কাকার ছেলের সঙ্গে কি সম্পর্ক হয়, তা তো জানিস্? কে জানে বাবা, কি যে জানিস্ আর কি কি যে জানিস্ না, ভগবানও তা জানেন না। বলেই দিই,—কাকার ছেলে হয় খুড়তুতো ভাই। দু'জনে যে হাঁ করে তাকিয়ে রইলি মুখের দিকে?

জহরলাল বলিল, আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

অনুপম বলিল, আমারও মনে হচ্ছে আপনাকে দেখেছি।

শঙ্কর বলিল, আপনার কোন্ ইয়ার?

অনুপম বলিল, ফোর্থ ইয়ার—সাইন্স। আপনার?

শঙ্কর বলিল, আমারও ফোর্থ ইয়ার—আর্টস্

বীরেশ্বর দুজনের আলাপ শুনিতেছিলেন। হঠাৎ ড্রাইভারকে গাড়ী ঘুরাইয়া বাড়ী ফিরিবার হুকুম দিলেন।

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিল, কলেজ যাব না?

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন, চুলোয় যাক তোর কলেজ। বাড়ী ফিরে দুজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেব। যতক্ষণ আপনি আপনি করে তোরা কথা বলবি, তালা খুলবো না। আমার নাতি তোরা, ভাইকে আপনি বলতে লজ্জা করে না তোদের? বয়সের কত তফাৎ জানিস তোদের? একুশ দিন।

তাদের মধ্যে কে একুশ দিনের বড় কে একুশ দিনের ছোট, বীরেশ্বরকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সাধ অনুপমেরও দেখা

গেল না, শঙ্করেরও দেখা গেল না। বাসের চারটা পয়সা নষ্ট হওয়ার শোক অনুপমের মনে মিলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কলেজ না গেলে যে পার্সেণ্টেজগুলি আজ নষ্ট হইবে, সে অপচয় তার কাছে আরও শোচনীয়। অসুখে ভুগিয়া তার অনেক পার্সেণ্টেজ নষ্ট হইয়াছে, নন-কলেজিয়েট হইয়া পরীক্ষা দিতে হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না অনুপমের, দশটা টাকাও বেশী লাগিবে। তবু, প্রতিবাদ করার বদলে সে চুপ করিয়া রহিল, গাড়ী ফিরিয়া চলিল যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে। ক্ষতি? ক্ষতির ভাবনাকেই আজ অনুপমের উপভোগ্য মনে হইতেছে। জীবনে একদিন বেহিসাবী কাজ করিয়া লোকসান হইয়াছে বলিয়া জীবনটা কি একদিনের জন্য ধন্য হইয়া যাইবে না? কলেজের পার্সেণ্টেজের ক্ষতির চেয়ে বড় রকম একটা ক্ষতি আজ হইতে পারে না? পকেটে একটা দশটাকার নোটও নাই যে রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়! পকেটে হাত ঢুকাইয়া নস্যের কৌটাটি বাহির করিয়া আনিতে গিয়া আবার খালি হাতটাই অনুপম বাহির করিয়া আনিল।

সে জানে, এ সাময়িক বৈরাগ্য নয়, অস্থায়ী পাগলামি, মন অস্থির হইলে এরকম হয়। নস্যের ডিবা ছুঁড়িয়া নয়, মানসিক অস্থিরতা চরমে উঠিয়া কত মানুষের কাছে সন্ন্যাসী হওয়া সহজ করিয়া দিয়াছে।

বড় তিনতলা বাড়ী, সামনে ছোট একটা বাগান। সহরের এই অংশ নির্জ্জন ও গম্ভীর, কারণ, একটা বাড়ী ও বাগান-বাড়ী নয়, পথের দুদিকের প্রায় সবগুলিই সামনে বাগানওয়ালা বাড়ী। বাড়ীগুলি যেমনই হোক, বাগানগুলি যেন বেঁটে বেঁটে উদ্ভিদের সাজান-গোছান দোকান, অল্প একটু জায়গায় যতগুলি সম্ভব অরণ্যানীর প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে। দেখিয়া হয়ত কারও চোখ জুড়ায়। জগতে অন্ধ যত আছে, চোখ-থাকিতে-অন্ধের সংখ্যা তো তার চেয়ে কম নয়।

ইতিমধ্যে অনুপম ও শঙ্কর পরস্পরকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় দুজনকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখার সঙ্কল্প বীরেশ্বরের আর দেখা গেল না। দুজনকে তিনি লইয়া গেলেন দোতলার অন্দরে, যেটা আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড একটা ঘর এবং যেখানে দুপুরবেলা বাড়ীর মেয়েরা খেলে তাস এবং পাড়ার মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে বসে মজ্‌লিস।

সীতা-পিসীমাই আগে আসিলেন। মাঝবয়সী বিধবা মানুষ তিনি, পরণে তাই ধবধবে সাদা হাতকাটা সেমিজ আর ধবধবে সাদা চুলপাড় ধুতি। কপালে চামড়ার ভাঁজে সৃষ্টি লম্বা রেখাটি অত্যন্ত স্পষ্ট। রেখাটি দুশ্চিন্তার নয়, চিন্তার। সাত বছর আগে সধবা অবস্থায় তিনি যখন পড়িতেনও কম, ভাবিতেনও কম, তখনও এই রেখাটি ছিল, তবে এত অস্পষ্ট যে, লোকে দেখিয়াও দেখিত না। তারপর বিধবা হইয়া তিনি পড়াশুনা করেন—মনস্তত্ত্ব আর দেহতত্ত্ব ছাড়া মানুষের সম্বন্ধে যত কিছু পড়িবার ও শুনিবার আছে সব।

এরকম পড়াশোনায় গভীর চিন্তাও বোধ হয় দরকার হয়। সাত বছরের চিন্তায় কপালের রেখাটি তাই স্পষ্ট আর গভীর হইয়া কপালটিকে তার দু'ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে বাঁ হাতের তর্জ্জনীর ডগা দিয়া রেখাটিকে তিনি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘষিয়া দেন। হয়ত তোয়াজ করেন, হয়ত মিলাইয়া দিতে চান।

পরিচয় পাওয়ার পরেই অনুপমকে তিনি চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, ওমা! তুমি সেই অনুপম! জলপাইগুড়িতে তোমাকে যে আমি ক'দিন ধরে দেখেছি, তবু চিনতে পারলাম না দেখে? কি আশ্চর্য্য মন মানুষের! তবে অনেকদিন আগে তোমায় দেখেছিলাম, দশ এগার বছরের কম নয়, ছোট ছিলে তখন তুমি। কত বয়েস তোমার এখন? উনিশ? দশ এগার বছর আগে যদি তোমায় দেখে থাকি,—ধরা যাক এগার বছর, তাহলে তখন তোমার বয়েস ছিল—

কপালের রেখায় চামড়ার ভাঁজ পড়িয়া গেল, নিজে নিজেই অবাক্ হইয়া সীতা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য মন মানুষের! উনিশ থেকে এগার বাদ গেলে কত যেন থাকে? দশ বাদ গেলে থাকে নয়, তাহলে এগার বাদ গেলে থাকবে আট। হ্যাঁ আট। তোমার তখন আট বছর বয়েস ছিল, না?

অনুপম বলিল, আমার ঠিক মনে নেই।

সীতা বলিলেন, আমার চেয়ে কত ছোট তুমি, আমার মনে নেই, তোমার মনে থাকবে? তোমরা এখন

কলকাতাতেই থাক, না? কোথায় থাক? বড়দা এখানেই আছেন, না?

অনুপম বলিল, বাবা আর বছর মারা গেছেন।

বীরেশ্বর আরাম-কেদারায় কাত হইয়া পিসী-ভাইপোর আলাপ শুনিতেছিলেন, অনুপমের কথা শুনিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর তাঁর স্তব্ধ নিশ্চল ভাব দেখিয়া মনে হইল, সোজা হইয়া বসিবার অতিরিক্ত আর সব ক্ষমতা তাঁর শেষ হইয়া গিয়াছে।

বড়দা নেই! বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে একটু সময় লাগিল সীতার। জীবনে একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য যে ভাইকে তিনি চোখে দেখিয়াছিলেন, সেই কয়েক দিনের মধ্যে একবারও যার কাছে ছোট বোনের মত ব্যবহার পান নাই, যে ধরিতে গেলে একরকম অজানা অচেনা অপরিচিত মানুষ, আর বছর সে মারা গিয়াছে এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কি কাঁদিতে পারে? চেয়ারে বসিয়া সীতা কাঁদিতে লাগিলেন, আর বীরেশ্বর চুপচাপ শুধু বসিয়া রহিলেন।

একুশ বছর বয়সে যে ছেলে জন্ম লইয়াছিল, আর পঁচিশ বছর বয়সে যে ছেলের সঙ্গে তাঁর হইয়াছিল বিচ্ছেদ, আজ তিয়াত্তর বছর বয়সে পাওয়া গেল তার মৃত্যুসংবাদ, সেই ছেলেরই ছেলের মুখে। পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা বীরেশ্বরের ছিল না। তিয়াত্তর বছরের জীবনে অনেক পিতাকেই তিনি পুত্রশোক পাইতে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু পরের শোক দেখিয়া এমন ভয়ানক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা কি মানুষের হয়!

শঙ্কর ঘরে ছিল না। পিতামহ ও পিসীমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অনুপম মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বীরেশ্বরের স্তব্ধভাব দেখিয়া আর সীতার মৃদু কান্না শুনিয়া হঠাৎ তার মনে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। আপনজন এরা ? এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এত দামী আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে বসিয়া তার বাবার মরণের খবরে এদের কাতর হইবার অধিকার কি আছে, কেবল ওই অর্গ্যানটা বেচিয়া সেই টাকায় চিকিৎসা হইলে তার বাবার যখন না মরিবার সম্ভাবনা ছিল ?

একে একে বাড়ীর অন্য সকলে ঘরে আসিতে থাকে। শঙ্কর, তার মা, শঙ্করের তিনটি বোন ও ছোট একটি ভাই, শঙ্করের এক মামা এবং এবাড়ীতে আশ্রিত ও আশ্রিতা তিনটি দূরসম্পর্কের মানুষ। আর আসে সাত আট বছরের একটি ছেলে। শঙ্করের বড় বোনটি যখন বছর খানেক আগে মারা গিয়াছিল, তার এই ছেলেটি তখন মানুষ হইতে আসিয়াছিল মামার বাড়ী।

দুম্‌দাম্‌ শব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটি সকলের ভাবভঙ্গি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া প'ড়ল। সীতার কান্না সকলকে যেন নির্ব্বোধ ও নিশ্চল পুতুলে পরিণত করিয়া দিয়াছে। কেউ জানে না ব্যাপারখানা কি, তবু সীতার মত মাঝবয়সী নারীর এরকম মৃদু ও মার্জ্জিত কান্নার যে বড়রকমের একটা কারণ থাকে এটুকু তো সকলে বোঝে! তা ছাড়া ঘরের আবহাওয়াটা যেন কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটি অপরিচিত যুবকের উপস্থিতি, সীতার শোক আর বীরেশ্বরের স্তব্ধভাব ছাড়া

আরও কি যেন একটা শোচনীয় রকমের খাপছাড়া বিষাদ ঘরের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে সহজবোধ্য অস্বাভাবিকতা।

শঙ্করের স্বর্গীয়া দিদির ছেলেটি একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া হাসিয়া ফেলিল। এইরকম স্বভাব ছেলেটার, খাপছাড়া কিছু দেখলেই সে হাসে। ছোটবড় যত কিছু অসঙ্গতি আছে জগতে, সব যেন তাকে সুড়সুড়ি দেয়।

শঙ্করের মা বলিলেন, ওকি সতু, ছি!

শঙ্কর বলিল, ফের যদি হাসবি তো কান মলে লাল করে দেব।

হুমকিতে থামিবার মত হাসি সতু হাসে না। মামার বাড়ীতে মা-মরা ছেলেকে কে মারিবে? হুমকি যে শুধু হুমকি সে তা জানে। তাই হাসি তার থামে না. কিন্তু তার হাসির চাপে সীতার কান্না বন্ধ হইয়া যায়!

সতু নাগালের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাত বাড়াইয়া তাকে কাছে টানিয়া অনুপম বীরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, এ ছেলেটি কে?—আর এক পা সামনে আগাইয়া শঙ্করের মা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে ঠাকুরঝি?

অনুপমের কথার জবাবে বীরেশ্বর বলিলেন, ও শঙ্করের দিদি মাধুরীর ছেলে। আর বছর মাধুরী মারা গেছে।

শঙ্করের মার কথার জবাবে সীতা বলিলেন, বৌদি, বড়দা আর বছর মারা গেছে।

ঘরের এতগুলি লোকের সকলের মধ্যেই কম বেশী ফাঁক

ছিল, অনুপম সতুকে কাছে টানিয়া লইল, তাদের একজনের মা ও অপর জনের বাবার মৃত্যুতে এতগুলি দুঃখিত মানুষের মধ্যে ওরা পৃথক হইয়া যাইতে চায় ; দুই জনে একসঙ্গে।

কিছুক্ষণের জন্য তাই তারা গেল। হাত ধরিয়া উপরে টানিয়া অনুপমকে লইয়া সতু হইয়া গেল উধাও। বেশী দূরে কোথাও নয় পাশের ঘরে,—যে ঘরে সতুকে বুকে করিয়া সীতা ঘুমান। বুকে অবশ্য সতুকে তিনি করেন সে যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন, জাগিয়া থাকিলে ওসব সতু ভালবাসে না, শীতের রাত্রেও নয়। মানুষের বুক ? যার মধ্যে কি একটা আশ্চর্য্য যন্ত্র ঢিপ্ ঢিপ্ করে আর ছোটছেলেকে নাগালের মধ্যে পাইলেই মানুষ যেখানে চাপিয়া ধরে প্রাণপণে, সেই মানুষের বুক ? সতু কখনও ওসব বুককে প্রশ্রয় দেয় না। তবে অনুপমের কথা ভিন্ন। আর কোনদিন তো অনুপম তাকে বুকে পিষিবার জন্য ব্যাকুল হয় নাই।

বুকে পিষিয়া চুমা খাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিবার পর অনুপম বুঝিতে পারে, সতু এক অদ্ভুত রকমের অস্বাভাবিক ছেলে, নূতন টাইপের পাগলা।

নাম জিজ্ঞাসা করার জবাবে সতু বলে, নাম ? জানো সীতাও আমার সঙ্গে এমনি করে।

তা বলি নি। তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছি।

বলছি। সীতা রোজ এমনি করে। যটা করে চুমু খেতে দেবে বলেছি, দিনে সব শোধ করে নেয়। রাত্তিরে চুপি চুপি

ডাকে, সতু ঘুমুলি ? আমি মটকা মেরে পড়ে থাকি, জবাব দিই না। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে খালি চুমু খায়। কি বলে জান ? বলে, আরো ছেলেবেলা তোকে যদি পেতাম সতু ! তোর মা যদি ক'বছর আগে মরত সতু !

সোজা স্পষ্ট অনর্গল কথা। বয়স্ক মানুষের পরিষ্কার শুদ্ধ ভাষা, এতটুকু ছেলেমানুষীর ছাপ নাই, কি যেন বুঝাইতে চায় সতু তাহাকে, তার সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত, আজ গ্রেটা গার্বোর ছবি দেখিতে না গেলে জীবনটা মাটি হওয়ার মত অসঙ্গতিপূর্ণ দুর্বোধ্য একটা ব্যাপার।

অনুপম কথা বলিতে পারে না, বলার সুযোগও ঠিক মত পায় না। সতু পাল্টা প্রশ্ন করিয়া তার নাম জানিতে চায়।

অনুপম বলে, তোমার নাম আগে বল, তবে বলব।

বললাম যে নাম ?

কখন বললে ?

ওই যে বললাম, রাত্রিরে সীতা চুপি চুপি ডাকে, সতু, ও সতু ঘুমুলি ? নাম বলব বলেই তো ওকথা বললাম। তোমার একদম বুদ্ধি নেই !

তাই মনে হয় অনুপমের। মনে হয়, এই বয়সেই মনোবিকারের ফলে বুদ্ধির এমন বিকাশ ঘটিয়াছে ছেলেটার যে, তুলনায় তার নিজের বুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, যা আছে সেটা শুধু বোকামি গোপন করার কায়দা।

সীতা আসিলেন। বলিলেন, তোমরা এ ঘরে বসে চুপি চুপি

গল্প করছ ! কি আশ্চর্য্য মন মানুষের ! আমি ভাবলাম, দুজনে গেল কোথায় ? এটা আমার শোবার ঘর, আমি আর সতু ওই খাটে শুই। আমি ছাড়া আর কারও কাছে ও শুতে পারে না। একবার আমার জ্বর হয়েছে, ডাক্তার কাছে শুতে বারণ করলে, ও শুলো গিয়ে তোমার বৌদির কাছে ! রাত দুপুরে চুপি চুপি উঠে এসে—

সতু দু'হাতে শক্ত করিয়া অনুপমের একটা হাত ধরিয়াছিল। হাতে একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, জানো সীতা খালি মিথ্যা কথা বলে।

সীতা তীব্র ভৎ'সনার স্বরে বলিলেন, মিথ্যা কথা বলি ! তুই কি রে সতু, এ্যাঁ ! যা তা বলছিস আমার নামে ? রাত দুপুরে উঠে আসিস্‌নি সেদিন তুই ?

সতু অনুপমকে চোখের ইসারা করিয়া বলিল, এসেছিলাম তো।

তবে ?

সতু নির্ব্বিকারভাবে বলিল, কি হয় এলে ?

সীতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, মুহূর্ত্তে নরম হইয়া গিয়া নিজের মৃদু ও মার্জ্জিত গলায় বলিলেন, তাই বল ! এক এক সময় তোর কথা শুনে গায়ে যেন জ্বর আসে।

হঠাৎ অনুপমের একটা আশ্চর্য্য কথা মনে হয়। মনে হয়, তার সীতা পিসীমা তার পরিচিতা কোন একটি মহিলাকে যেন নকল করিতেছেন। কিন্তু কে যে সেই পরিচিতা মহিলা, অনুপম কিছুতেই তাহা স্মরণ করিয়া উঠিতে পারে না।

ঘণ্টা তিনেক কোন রকমে কাটান গেল, তারপর অনুপমের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। এ বাড়ীতে অকারণে মানুষের মনে বড় কষ্ট। কোন অভাব না থাকায় সকলের স্বভাব গিয়াছে বিগড়াইয়া. জীবনে রস-কস যা আছে সব শক্ত, জমজমাট, যেমন-তেমন উত্তাপে গলিয়া জীবনকে রসাল করিতে চায় না। কোন্ দৃষ্টিতে ইহাদের দেখিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনুপম শেষ পর্য্যন্ত অপরিচয়ের সংকোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। শঙ্করের মাকে কারও মা মনে করিতে তার রীতিমত কষ্ট হয়। মুখে তিনি এখনও ক্রীম পাউডার মাখেন বলিয়া নয়, সাজগোজ করিয়া এখনও তিনি নিজের অপূর্ব্ব রূপশ্রী নষ্ট করেন বলিয়া নয়, নিজের চারিদিকে একটা গভীর বিষাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া নিজের চরম স্বার্থপরতাকে তিনি পরিস্ফুট করিয়া রাখেন বলিয়া। তাঁর দৃষ্টি বিষণ্ণ, কথা বিষণ্ণ, মুখের ভাব বিষণ্ণ, বিষণ্ণতার ভারে মন্থর ও ভারাক্রান্ত তাঁহার চালচলন, ভাবভঙ্গি।

প্রথমে শোকের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি যখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একমাত্র তাঁকেই অনুপমের মনে হইয়াছিল প্রকৃত শোকাতুরা. কিন্তু জিনিষটা খাঁটি মনে হইলেও বিষাদের বাড়াবাড়িতে সে একটু ক্ষুণ্ণ ও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, তারপর ধীরে ধীরে সকলের ব্যথিত ভাব কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ-কথা সে-কথায় চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল অনুপমের পিতার মৃত্যুর কথা, এই সংসারের যে নিজস্ব গতিটি আছে সেই গতি কম

বা বেশী সময়ের জন্য দাবী করিতে লাগিল এ-কে আর ও-কে,
—আকাশ-পাতাল যাতায়াত করিতে লাগিল যারা অনুপমের
আশে-পাশে রহিল তাদের মুখের আলোচনা, কিন্তু শঙ্করের মার
কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বীরেশ্বরের কথায় কয়েকবার
সকলে যখন হাসিয়া পর্য্যন্ত উঠিল, তখনও তিনি হইয়া রহিলেন
নিরবিচ্ছিন্ন বিষাদের প্রতিমা। রাত্রির অন্ধকারে ঘরের যে
অন্ধকার কোণ মিশ্ খাইয়া গিয়াছিল, দিনের আলোতেও সে
কোণ হইয়া রহিল অন্ধকার, বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট।

এ সখ অনুপমের কেন চাপিয়াছিল বলা যায় না, একবার সে
বলিয়াছিল, আপনাকে প্রণাম করা হয় নি।

বলিয়া শঙ্করের মাকে করিয়াছিল প্রণাম।

শঙ্করের মা বলিয়াছিলেন, আমাকে আবার প্রণাম!

আর কেউ নন্, তিনি কাকীমা। সে হিসাবে অনুপমের
প্রণাম শুধু তাঁর প্রাপ্য নয়, গ্রহণীয়। কিন্তু তার মধ্যে অনু-
পমের প্রণামের প্রতিক্রিয়া আর তাঁর মুখের কথা শুনিয়া কে
বলিবে পথের ভিখারিণী তিনি নন, একটা পয়সার বদলে প্রণাম
পাইয়া তিনি মরিয়া যান নাই মরমে!

অনুপমের মনে হইতে লাগিল, প্রণাম সে করে নাই শঙ্করের
প্রণম্যা মাকে, মরা একটা মানুষকে খাঁড়ার ঘা দিয়াছে।

শঙ্করের মার এই খাপছাড়া চিরস্থায়ী বিষাদ অনুপমের মন-
কেমন করাকে আরও বেশী বাড়াইয়া দিয়াছে। তিন ঘণ্টায়
তিনশ বার তার মনে হইয়াছে পলাইয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু

যাওয়ার কথা বীরেশ্বর কানে তুলিতে চান না, হাসিয়া উড়াইয়া দেন। আর দেন খোঁচা। এ কি পরের বাড়ী যে যাওয়ার জন্য অনুপম ব্যাকুল?

তা নয়, কাজ আছে।

কি কাজ? কলেজ আজ তোমার যাওয়া হবে না।

কলেজ নয়, বাড়ী যাব।

সে তো আমিও যাব। বেলা পড়ুক, দুজনে মিলে যাওয়া যাবে একসঙ্গে।

আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন?

হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়াই অনুপম লজ্জা বোধ করে। তার প্রশ্নের মধ্যে বীরেশ্বরের এতকাল তাদের বাড়ী না যাওয়ার ইঙ্গিতটা এমন কদর্য্য শোনায়!

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলেন, তোর বাবা আমাকে তোদের বাড়ী যেতে দিত না অনু।

এটা ঠিক কি ধরণের কৈফিয়ৎ ঠাহর করিতে না পারিয়া অনুপম চুপ করিয়া থাকে।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়

বীরেশ্বর, শঙ্কর, অনুপম আর সতু এই চারজনে যখন অনুপমের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, রোদ পড়িয়া আসিয়াছে। শঙ্করের আসিবার ইচ্ছা ছিল না, বীরেশ্বর তাহাকে জোর করিয়া আনিয়াছেন। সতুকে কারও সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা ছিল না, সে জোর করিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

রঙ-চটা সদর দরজা, খড়ি দিয়া নম্বর লেখা, তাও কাঁচা হাতের। বাড়ীর বাহির হওয়ার সময় হইতে শঙ্কর অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বড় রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া গলিতে প্রবেশ করার পর সে অস্বস্তি হু হু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নোংরা গলি বলিয়া নয়, গরীব আত্মীয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া। একটি গরীব বন্ধু ছিল শঙ্করের, একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই গরীব বন্ধুটি। সে অভিজ্ঞতা শঙ্কর জীবনে ভুলিবে না। গরীব বন্ধুটি কিন্তু তার বাড়ীতে আসিয়া চমৎকার মিশ্‌ খাইয়া যাইত সকলের সঙ্গে, যেটুকু মিশ্‌ খাইত না সেটুকুও আপশোষ করার মত কিছু নয়। কিন্তু গরীবের অন্তঃপুরে শঙ্কর বিদেশী, বেমানান। কথা ও ভদ্রতার আদান-প্রদানে সেখানে নিজেও সে হোঁচট খায় বারবার, অন্যান্য সকলকেও হোঁচট খাওয়ায়। গরীব মানুষকে বড় ভয় করে শঙ্কর, গরীব মানুষের অন্দরমহলে সে জেলখানার কয়েদী, আধঘণ্টা সেখানে থাকিলে

তার নিজেকে বাড়ীর ছেলেবুড়ো সকলের ঘৃণা-মেশানো কৃপার পাত্র বলিয়া মনে হইতে থাকে।

কড়া নাড়িতে অনুপমের মা সাধনা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিবামাত্র বীরেশ্বরকে তিনি যে চিনিতে পারিয়াছেন সেটা এমন স্পষ্ট বোঝা গেল যে, অনুপম কথা বলা দরকার মনে করিল না। সাধনা মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন, সকলের প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিলেন, তারপর একপাশে সরিয়া বলিলেন, আসুন।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া শঙ্কর একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মনে মনে সে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, নোংরা সেঁতসেঁতে একটা বাড়ীর, যেখানে বাতাসে মেশানো থাকে ভোঁতা দুর্গন্ধ, মানুষের মুখে থাকে ব্যর্থ লোভের ছাপ, চারিদিকে ছড়ান থাকে ভাঙ্গা জীবনকে জোড়াতালি দিয়া দিন কাটানোর আয়োজন। এবাড়ীর উঠান ভিজা কিন্তু সেঁতসেঁতে নয়, এবাড়ীর বাতাসে গন্ধ শুধু রান্নার, এবাড়ীর মানুষের মুখে ছাপ শুধু অভাবের, এবাড়ীতে দিন কাটানোর আয়োজন শুধু কম দামী।

তাছাড়া এত ছোট একটা বাড়ীতে এত তুচ্ছ সব আসবাব ও জিনিষপত্রগুলিকে কেহ যে এত যত্নে গুছাইয়া রাখিতে পারে, শঙ্করের সে ধারণা ছিল না। মেঝের যেখানে যে জিনিষটি থাকার কথা সেইখানে সেই জিনিষটি রাখা হইয়াছে, একচুল এদিক-ওদিক নয়। জানালার জিনিষ আছে জানালায়, তাকের জিনিষ আছে তাকে, দেয়ালের জিনিষ আছে দেয়ালে,—দেখিলেই বুঝা

যায় সর্ব্বদা একটি সতর্ক দৃষ্টি এই ছোটবড় স্থাবর পদার্থগুলিকে পাহাড়া দেয়, জানালায় পানের ডাবরের ডানদিকে রাখা কুচানো স্থুপারির ছোট পিতলের বাটিটি যেন বাঁ দিকে কখনো না আসে তাই দেখিবার জন্য।

বসিতে দেওয়ার জন্য মাদুর বিছানোর সময় প্রমাণ পাওয়া গেল, এ সতর্ক দৃষ্টি কার।

রোগা লম্বা একটি মেয়ে মাদুরটা বিছাইয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানমাত্র সাধনা বলিলেন, অর্দ্ধেক মাদুর যে ভাঁজ হ'য়ে রইল নিমি ?

ভাঁজ খুলিয়া মাদুরটা টান করিয়া পাতিয়া দিয়া নিমি সোজা হইয়া দাঁড়ানমাত্র সাধনা আবার বলিলেন, অতগুলি দেশলায়ের কাঠি আবার ঘরে এল কোত্থেকে ? কুড়িয়ে ফেলে দিয়ে আয় বাইরে।

তিনটি পোড়া দেশলায়ের কাঠি কুড়াইয়া নিমি আবার যেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সাধনা আবার বলিলেন, ইনি তোর ঠাকুর্দ্দা নিমি, প্রণাম করে যা।

বলিয়া এতক্ষণ পরে নিজেও বীরেশ্বরকে প্রণাম করিলেন।

এত যত্নে মাদুর পাতা হইল, কিন্তু বীরেশ্বর ছাড়া মাদুরে কেহ বসিল না। ঘরে ছোট একটা টুল ছিল, সেটাতে বসিয়া শঙ্কর উসখুস করিতে লাগিল আর সতু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ঘরের সর্ব্বত্র। বসানর চেষ্টা করিয়াও তাকে বসাইতে পারা গেল না। সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, বড় অবাধ্য ছেলে তো।

হঠাৎ রাগে শঙ্করের গা যেন জ্বলিয়া উঠিল। জোরে ধমক দিয়া বলিল, বসলি সতু? কান মলে ছিঁড়ে ফেলব তোর।

সাধনা বলিলেন, আহা, অমন করে ধমকাতে আছে ওই-টুকু ছেলেকে? হঠাৎ একবার ধমক দিয়ে মারধোর করলেই কি ছেলেপিলে বাধ্য হয় বাবা? বাধ্যতা শেখাতে হয়। স্বভাব নিয়ে তো জন্মায় না ছেলেমেয়ে, চাদ্দিকে যারা থাকে তারা তার স্বভাব গড়ে তোলে।—ওমা, ধমক খেয়ে ও যে হাসছে!

বীরেশ্বর বলিলেন, হাসি ওর একটা ব্যারাম, ধমকালেও হাসে, না ধমকালেও হাসে।

এমন ছেলে তো দেখিনি কখনো!

বলিয়া সাধনা বোধ হয় ভাল করিয়া দেখিবার জন্যই সতুকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একবার তার মুখখানার দিকে চাহিয়া সতু ছিটকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, খুব দুরন্ত, নয়?

বীরেশ্বর বলিলেন, হ্যাঁ।

বীরেশ্বরের এই জবাবে ঘরের মানুষগুলির কথা বলার সব প্রয়োজন যেন ফুরাইয়া গেল, কারও কিছু জিজ্ঞাস্য নাই, কারও কিছু জবাব দিবার নাই। এরকম অবস্থা শঙ্কর আরও সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছে, তার বন্ধু-পরিবারের গৃহে। কিন্তু সে সব পরিবারে তাল সামলানোর মানুষ থাকে। হয় বাড়ীর গৃহিণী, নয় তার পাকা-পোক্ত মেয়ে মৃদু একটু হাসে, খাপছাড়া একটা কথাকে যেখান হইতে পারে টানিয়া আনিয়া আলাপে জুড়িয়া দেয়,

স্বাভাবিক স্তব্ধতার বাধাকে ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া চলিতে থাকে সকলের কথোপকথন। কিন্তু আজ? আজ কে এই আত্মীয়-আত্মীয়ার বৈঠকে আলাপের ভূমিকা রচনা করিবে? আজ যখন প্রথম সংবাদ পাইয়াছেন, ধরিতে গেলে আজই বীরেশ্বরের ছেলে মরিয়া গিয়াছে,—কয়েক ঘণ্টা আগে। সেই ছেলের বিধবা-বেশধারিণী বধূর সামনে বসিয়া কার পক্ষে আজ কি বলা সম্ভব? বলার কথা অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সে সব কথা মানুষকে রাখিতে হয় নেপথ্যে, কারণ, হৃদয় চিরদিন নেপথ্যবাসী, হৃদয়ের কথা বাহিরে আনা ছেলেমানুষী কাজ।

সাধনা বলিলেন, আপনার শরীর বেশী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, বাবা।

বীরেশ্বর বলিলেন, শরীর দুর্ব্বল হবার বয়সে এসে পৌঁছেছি, মা। তবু যা সবল আছি তাতেই ভাবনা ধরেছে, আরও কতকাল এ পারে আটকে থাকব।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তুমি তো আমার ঠিকানা জানতে বৌমা, আমাকে একটা খবরও দিলে না?

সাধনা নতমুখে বলিলেন, বারণ করে গিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলিলেন, তুমি তো গোড়া থেকে সবই জান বৌমা, তোমার স্বামীর কাছে আমি কোন অপরাধ করিনি। অপরাধ যদি করে থাকি, তার মার কাছে করেছিলাম। তবু শেষ সময়েও আমায় সে ক্ষমা করে যেতে পারল না?

সাধনা বলিলেন, তা নয় বাবা, তিনি বলে গিয়েছিলেন,

সারাজীবন আপনাকে অকারণে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, এ খবরটা গোপন রাখাই ভাল।

অকারণে! বীরেশ্বর সোজা হইয়া বসিলেন।

তাই বলে গিয়েছিলেন। আমিও ভেবে দেখলাম এই বয়সে আপনাকে আর—

খবরটা পাবার আগেই আমি হয় তো চোখ বুজতে পারি ভেবে তুমিও চুপ করে ছিলে, না বৌমা?

মনে হয় বীরেশ্বর রাগ করিয়াছেন। এক বছর তাঁহাকে পুত্রশোকের স্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। সাধনা কথা বলিলেন না। শঙ্কর শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার বীরেশ্বরের দিকে, একবার সাধনার দিকে চাহিতে লাগিল। অতীতের গহ্বর হইতে কিসের যেন আবির্ভাব ঘটিয়াছে এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে, এতকাল মানুষের হৃদয়কে যা শোষণ করিয়াছে,—কয়েকটি সম্পর্কিত মানুষের হৃদয়। অনুপম ও নিমি ঘরে ছিল, তাদের শঙ্কর দেখিতে পাইল না, ওরা অশরীরী অতীতের আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বীরেশ্বরের রাগ যদি হইয়া থাকে, অনুপম যখন তাদের বাড়ীতে খবরটা দিয়াছিল তখন রাগ হয় নাই কেন? অনুপমের মার উপরে রাগ করিবার কি কারণ আছে বীরেশ্বরের?

বীরেশ্বর দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি কলেজে পড়েছিলে, না বৌমা?

হ্যাঁ।

এতদিন সংসারে বাস করছ, একা এতকাল সংসার চালিয়ে এলে, সাংসারিক জ্ঞানও তো তোমার আছে ? তুমি তো বুদ্ধিমতী ?

একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?

করব না ? নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে তুমি কতগুলি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছ, ভাবতে পার ? একটা খবর পেয়ে শেষ সময়ে আমি যদি আসতে পারতাম, একদিনে পঁচিশ বছরের গণ্ডগোল মিটে যেত। ছেলের শোক ? কিসের শোক আমার ? ছেলে আমার যেখানে গেছে, আজ বাদে কাল আমি সেখানে চলে যাব। তার চেয়ে আমার ভুলটা সংশোধন করার সুযোগ দিলে কি তুমি আমাকে বেশী দয়া দেখাতে না বৌমা ?

সাধনা তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন, তা হ'ত না বাবা।

হ'ত না ? কেন হ'ত না ?

সাধনা চুপ করিয়া থাকেন, শঙ্কর অসহায়ের মত বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এবার কি কারবেন বীরেশ্বর ? তিয়াত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া আজ কি বীরেশ্বর ধমক দিবেন পঁচিশ বছর যে ছেলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, সেই ছেলের মাঝবয়সী স্ত্রীকে ? একি কলহ আজ বাধিয়া গেল এঁদের !

বীরেশ্বর আবার বলিলেন, ছেলেমানুষী কোরো না বৌমা। কেন হ'ত না স্পষ্ট করে বল।

বলে কি হবে বাবা ? অনর্থক মনে কষ্ট পাবেন।

তুমি বুঝি ভেবেছ, মনে আমি কোনদিন কষ্ট পাইনি, তুমি যে কষ্ট দেবে সইতে পারব না ? আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও, তোমার যা বলবার আছে তাই বল সোজা ভাষায়, আমি হাত জোড় করছি তোমার কাছে।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি হতে দিতাম না বাবা।

তুমি হতে দিতে না ?

না। হতে দিতাম না, কোন দিন দেবও না।

বীরেশ্বর ঝিমাইয়া পড়িলেন। শঙ্কর জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিতে পাইল, কাদের দোতলা বাড়ীর উপরের ঘরের একটি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া শেষ-বেলার রোদ এ বাড়ীর ভিজা উঠানের সেইখানে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে এইমাত্র নিমির সমবয়সী একটি বিধবা মেয়ে এঁটো বাসন মাজিতে বসিল।

আয়নায় প্রতিফলিত রোদ আসিয়া পড়িবার কোন দরকার ছিল না, মেয়েটির এঁটো বাসন মাজিতে বসিবার ভঙ্গীতেই যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল শঙ্করের। ঘরে তার ঠাকুরদাদা আর জেঠাইমার মধ্যে যে সবাক নাটকের অভিনয় চলিয়াছে, সে নাটক গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিয়াছে এক শতাব্দীর চার ভাগের এক ভাগ, চৌবাচ্চা হইতে আর এক বালতি জল তুলিয়া এঁটো বাসন মাজিতে বসিয়া উঠানে মেয়েটি তার চেয়েও জমকালো নাটকের সূচনা করিয়া দিল এক মিনিটে। লম্বা-চওড়া অ-বাঙ্গালীর মেয়ের মত শরীর, স্বাভাবিক রঙিন্ রঙ, পরনে অতিরিক্ত

সাদা থান, এ সবের জন্য নয়, এ সব মিলিয়া জমকালো হইয়াছে শুধু মানুষটা,—নাটকীয় তার অকথ্য অবর্ণনীয় রাজরাণীর ভঙ্গীতে বাসন মাজিতে বসা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়া আর যেন কাজ খুঁজিয়া পায় নাই, তাই রাগের মাথায় বাসন মাজিতে বসিয়াছে। রাগ কমিলেই সিংহাসনে গিয়া বসিবে।

বাসন মাজা শেষ করিয়া সে কিন্তু আসিয়া বসিল শঙ্করের কাছেই, চারিটি পায়া-লাগানো এক টুকরা কাঠের তক্তায়। বসিবার জন্য অবশ্য সে আসে নাই, আসিয়াছিল ভাঁড়ার ঘরের চাবি চাহিতে, আর কিছু নয়। ঘরে অন্য মানুষ আছে কি না কে তা জানে! কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন বীরেশ্বর বোধ হয়, মৃত পুত্রকে লইয়া পুত্রবধূর সঙ্গে উচ্ছ্বাসের আদানপ্রদান বন্ধ করিবার জন্য।

মেয়েটি কে বৌমা ?

ও ? তরঙ্গ।

তরঙ্গিনী ?

জবাব দিয়াছিল মেয়েটি নিজেই, না, শুধু তরঙ্গ।

রসিকতা জমে না, কিছুক্ষণ জমিবেও না। তবু বীরেশ্বর রসিকতার ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন, তরঙ্গ আমাদের কে ?

সম্পর্কের কথা বলছেন ? সম্পর্ক কিছু নেই, আমি এখানে থাকি।

স্পষ্ট বলে দিলে দিদি সম্পর্ক নেই ! আমি যে তোমার দাদু ?

তরঙ্গ বলিয়াছিল, ঠাকুরদা না দাদামশায় ?

তখন সাধনা করিয়া দিয়াছিলেন পরিচয়। তরঙ্গকে বলিয়াছিলেন, ইনি আমার শ্বশুর তরঙ্গ, আর এ অনুপমের ভাই শঙ্করলাল। আর বীরেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, রঞ্জনী ঠাকুরপোকে আপনার বোধ হয় মনে নেই বাবা, তরঙ্গ তার সেজ মেয়ে।

অতি খাপছাড়া ভাবে তরঙ্গ তখন নমস্কার করিয়াছিল দুজনকে, হাততালি দেওয়ার মত জোরে দু'হাতের তালু সে একত্র করিয়াছিল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় হাত দুটি তার কোমল বলিয়া আওয়াজটা জোরালো হয় নাই। তারপর সাধনার হুকুম হইয়াছিল বসিবার। সহজ, স্বাভাবিক, সুশ্রাব্য হুকুম, মিনতি করার মত।

বসছি। সব কাজ কিন্তু পড়ে রইল জেঠিমা।

ছি, তরু। কতবার তোমায় বলেছি, বাড়ীতে বাইরের লোক এলে মেয়েদের কোন কাজ থাকে না, যাঁরা এলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা, তাঁদের সুখ-সুবিধা দেখা, এই শুধু তখন মেয়েদের কাজ। এরা না হয় আত্মীয়, অন্য কেউ হলে কি রকম অস্বস্তি বোধ করতেন বল তো ? ভাবতেন যে এসে সংসারের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, বেশীক্ষণ বসা চলবে না। যে বাড়ীতে এসে মানুষ স্বস্তি পায় না, সেটা কি বাড়ী, না, সে বাড়ীতে কাজ বলে কোন কিছু আছে ! দরকার হলে সারাদিন অন্য কর্ত্তব্য করে যে মেয়ে সংসারের সব কাজ করতে পারে, সেই তো কাজের মেয়ে। জানালা দিয়ে দেখলাম, তুমি বাসন মাজতে বসলে, তখন কিছু বলিনি ! কিন্তু আর কোনদিন এ রকম ক'রো না তরু,

এত করে যা শেখাই, তা যদি ভুলে যাও, বড্ড কষ্ট হয় আমার।—কটা বাজল রে নিমি? সাড়ে পাঁচ! ও মা, এখুনি কলের জল চলে যাবে!

খাবার জলটা তুলে রেখে আসব জেঠিমা?

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, না, তুমি ব'সো। নিমি জল তুলতে যাক। বড় পিতলের কলসীটা কলতলায় নিয়ে যাস না নিমি, আনতে পারবি না। ছোট কলসীতে কলের জল ভরে নিয়ে গিয়ে ও কলসীটা ভরিস। ঢাকনিগুলো তিনদিন ধোয়া হয় নি, একটু সাবান দিয়ে ধুয়ে দিস্। গায়ে মাখা সাবান নয় কিন্তু, কাপড়কাচা সাবান। বাথরুমের খোপে দেখবি দু'টুকরো সাবান আছে কাপড়কাচা, ছোট টুকরোটা নিস্। আর শোন্—সবকথা না শুনেই চলে যাস কেন বল্ তো? তোদের শিখিয়ে শিখিয়ে আর পারলাম না নিমি—একটা কথা কতবার করে শেখাব? কি বলছিলাম? যা, সব গোল পাকিয়ে গেল!

মৃদু একটু হাসিলেন সাধনা, হাসির সঙ্গে সখেদে বলিলেন, কি যেন হয়েছে আমার মাথাটার, চারিদিকে আর নজর রাখতে পারি না, সংসারের কথা ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে ওঠে।—হ্যাঁ, খাবার জল তুলে ষ্টোভটা ধরিয়ে আমায় ডাকিস নিমি। আবার সব কথা না শুনে চলে যায়! তোর আজ কি হয়েছে বল তো নিমি? ষ্টোভ ধরাবার সময় স্পিরিট জ্বলবার আগে দুধের কড়াটাই বসিয়ে দিস্ ষ্টোভে। কড়ায়ের

ঢাকা নামিয়ে যেন আমায় ডাকতে আসিস না, বেড়ালে মুখ দেবে।

দুধ যদি ফুটে ওঠে মা?

ফুটে উঠবে! স্পিরিটটুকু জ্বলবে আর পাম্প করে আমায় ডাক্‌বি, তার মধ্যে দেড় সের দুধ ফুটে উঠবে? আজ তোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না নিমি, তোর মাথার ঠিক নেই। তুই বোস, আমি যাই।

নিমি ব্যাকুল ভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, না, তোমার যেতে হবে না, আমি পারব।

সাধনা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ছি, নিমি। আমি যা বলছি, তা'কি না ভেবে না হিসেব করে বলছি? কথা শোনো, এইখানে বোস, এঁদের দু'খানা গান শুনিয়ে দাও তোমরা দুজনে ততক্ষণ, আমি চোখের পলকে কাজ ক'টা সেরে আসছি, ও আর কতক্ষণের কাজ? নিমি আগে গেও,—বাইরে উঠেছে ঝাঁঝালো রোদ। তরু তুমি কি গাইবে? আকাশের সীমা বাতাসের নীল, আলো দূরে, বহুদূরে?

অরঙ্গ বলিল আচ্ছা।

সাধনা বীরেশ্বরকে বলিলেন, আমি যাই বাবা? ওদের গান শেষ হতে না হতে আসব।

সাধনা চাহিলেন অনুমতি, অনুমতি দেওয়ার বদলে বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওদের গান শিখিয়েছ, না বৌমা?

হ্যাঁ। নিমিকে ছেলেবেলা থেকে শিখিয়েছি, ও ভাল

গাইতে পারে, কিন্তু গলাটা তেমন মিষ্টি নয়। তরু অল্পদিন শিখছে, গানের কায়দা এখনও নির্খুত হয় নি, তবে গলা ভারি মিষ্টি। নিমির চেয়ে ওর গান আপনাদের ভাল লাগবে, তাইতো আগে নিমিকে তারপর তরুকে গাইতে বললাম। কলের জল চলে যাবে বাবা, আমি আসছি।

কলের জল যায় এবং আসে, সময় যায় এবং থাকে। সত্যই থাকে,—সব সময়। মানুষের জীবনকাহিনী সাময়িক, কিন্তু বোকামি যাদের ব্যাধি, আবর্তন ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে পূর্ব্বানুবৃত্তি আর ক্রমশঃ ছাড়া বুঝিতে পারা তাদের পক্ষে অপরাধ। অন্ততঃ বুদ্ধিমানেরা তাই স্থির করিয়া দিয়াছে বোকাদের জন্য। তরঙ্গ কাছে আসিয়া বসা মাত্র শঙ্করের মনে যে ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল, তার মধ্যে মিশিয়াছিল অনেকখানি অস্বাভাবিকতা। কিন্তু সেটুকু বুঝিবার মত মন তো শঙ্করের নয়, দশদিন তরঙ্গের সঙ্গে দেখা-শোনা হওয়ার পর এটা ঘটিলে তবু সে বুঝিতে পারিত ভাবাবেগের এতখানি অস্বাভাবিকতার ইতিহাস আছে এবং সেইজন্য এই অস্বাভাবিকতার খানিকটা স্বাভাবিক, কিন্তু তরঙ্গকে দেখিয়াই বিচলিত হওয়ার জন্য নিজেকে নির্লজ্জ মনে করিয়া সে বড় কষ্ট পাইতেছিল। একবার সতুকে পাওয়া গেল। নিমি বাহিরে ঝাঁঝাঁলো রোদ উঠিবার গান গাহিল, তরঙ্গের গানে নীল আকাশের সীমানা পাওয়া গেল বাতাসে। তবু অপরাধের ভয়ে শঙ্করের মনে শান্তি রহিল না।

বীরেশ্বরের মনেও শান্তি ছিল না, প্রায় একই ধরণের নারী-সংক্রান্ত অপরাধের অনুভূতিতে। অথচ কতদূর স্বাভাবিক ও সামাজিক ছিল তাঁর অপরাধ!—দু'বার বেশী বিবাহ করা। অভিজ্ঞতার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী অসংযম বীরেশ্বরের জীবনে কোনদিন আসিতে পারে নাই। পুরুষ মানুষের পক্ষে তিনবার বিবাহ করায় কি অন্যায় থাকিতে পারে এখনও তিনি তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তবু এবাড়ীতে বহুদিন ধরিয়া সঞ্চিত অব্যক্ত ধিক্কার অনুভব করিয়া তিনি কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। এমনিভাবে একদিন তিনি তাঁর বংশের প্রায় অজানা শাখাটির সঙ্গে পরিচিত হইতে আসিবেন, এই ক্ষুদ্র ঘরখানির মৃদু অজানা সুবাসমেশানো বাতাস নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ বাঁচিতে বাধ্য হইবেন, একথা জানিয়াই যেন তাঁকে শাস্তি দিবার জন্য অনুপমের বাবা আর ঠাকুরমা তাঁর মনের স্থায়ী অশান্তির সঙ্গে পাপের উপলব্ধি মিশিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে!

ক্ষোভে বীরেশ্বরের চোখে জল আসিতে চায়। বিপরীত অস্বাভাবিক শাসন-পীড়ন মানুষের জীবনে? স্বামী ত্যাগের অপরাধ করিল অনুপমের ঠাকুরমা, আর সমস্ত জীবন মনোকষ্ট সহ্য করিয়াও তার নিস্তার হইল না, আত্মমর্য্যাদাটুকু পর্য্যন্ত আজ হারাইতে হইবে!

সাধনার সঙ্গে চা জলখাবার আসিল। জলখাবার বিশেষ কিছু নয়, ঘিয়ে ভাজা, দুধে সিদ্ধ চিনি-মেশান সুজি আর

কয়েকখানা বিস্কুট। বীরেশ্বর এসব কিছু খানও না, সন্ধ্যা না করিয়া কিছু খাইবেনও না। এখানে সন্ধ্যা করিয়া কিছু খাওয়া ? না. সন্ধ্যার সময় তিনি যাইবেন, আহ্নিক করিবেন অনেকক্ষণ, তারপর কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িবেন।

সন্ধ্যা আসিতে আসিতে গভীর ক্লান্তি আসিল। বীরেশ্বর উঠিলেন। সকলে একসঙ্গে নামিয়া গেল নীচের উঠানে। সেখানে বীরেশ্বর শ্রান্ত স্বরে সাধনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ও বাড়ীতে যাবে না বৌমা ?

কেন যাব না বাবা ?

একদিন গিয়ে সংসারটা দেখে আর মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় করে এসো। তারপর তোমাকে একটা অনুরোধ জানাব।

কি অনুরোধ করবেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব হবে। আমার পক্ষে আপনার ওখানে গিয়ে থাকা—

বছরখানেক আগে যে মরিয়া গিয়াছে তাকে লইয়া আজ দুজনের মধ্যে যে কলহ বাধিয়াছিল, শঙ্করলালের একবার ভয় হইয়াছিল বীরেশ্বর বুঝি ধমক দিয়া বসেন সাধনাকে। তখন বীরেশ্বর আত্মসম্বরণ করিয়াছিলেন, এখন বিদায় নেওয়ার সময় সাধনার কথা শুনিবামাত্র রাগে আগুন হইয়া এত জোরে তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল সাধনার তখনকার প্রাপ্য ধমকটাই সুদে-আসলে তিনি দান করিয়া যাইতেছেন।

তোমার বুদ্ধি খুব টনটনে, সব তুমি বুঝতে পার, তা জানি

বৌমা। কিন্তু আমি কি বলব শুনে তারপর পাকামি ক'রো।
এখন থাম। তোমাদের পাকামির চোটে সংসারে মানুষের টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছে।

হন্ হন্ করিয়া তিনি চলিয়া যান, সাধনা ডাকিয়া বলিলেন, একটু দাঁড়ান বাবা, প্রণাম করব।

আমার বাড়ীতে গিয়ে ক'রো।

দড়াম্ করিয়া সদরের দরজা খুলিয়া বীরেশ্বর বাহির হইয়া গেলেন, পিছনে গেল শঙ্কর। গলির মোড়ে মোটরে উঠিবার সময় সে-ই খেয়াল করিল যে, সতুকে ফেলিয়া আসা হইয়াছে।

সতু রয়ে গেছে দাদা।

বীরেশ্বর গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বলিলেন, নিয়ে আয়। শীগগির আসিস্।

সদর দরজা বন্ধ হয় নাই। ভিতরে ঢুকিয়া শঙ্কর দেখিতে পাইল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই উনানে আঁচ পড়িয়াছে, সাধনা তরকারী কাটিতে বসিয়াছেন, নিমি আটা মাখিতেছে আর তরঙ্গ বসিয়াছে মসলা বাটিতে। তরঙ্গের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সতু যেন তাকে কি বলিতেছিল, শঙ্করকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, সতু আয়।

সতু বলিল, না।

এতটুকু সময়ের মধ্যে কি করিয়া যে তরঙ্গের সঙ্গে এত ভাব জমিয়া গেল সতুর! শঙ্কর আরো দু'পা আগাইয়া আসা মাত্র সে দুইহাতে গলা জড়াইয়া ধরিল তরঙ্গের।

তরঙ্গ বলিল, আপনারা যখন উপরে বসে ছিলেন, চিলেকুঠিতে গিয়ে খোকা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে আপনাদের সঙ্গে যাবে না, এখানে থাকবে।

সাধনা বলিলেন, যেতে যখন চাইছে না, আজ থাক। কাল আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।

কাল আপনারা যাবেন ?

বাবা যেরকম রাগ করে গেলেন, কাল যাওয়াই ভাল। উনি বলে গিয়েছেন, বাবার মনে যেন কষ্ট না দিই। জান শঙ্কর, আমার হয়েছে বিপদ। এমন কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন উনি, যার একটা রাখতে গেলে আর একটা রাখা যায় না। দোটানায় দোটানায় প্রাণ আমার বেরিয়ে গেল বাবা।

সাধনার আপশোষে নীরবতার সায় দিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, কাল কখন গাড়ী পাঠিয়ে দেব ?

সাধনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, গাড়ী কি হবে ? বিষ্যুদবার তো কাল ? অনুপম কাল দেরীতে কলেজে যাবে, ওর সঙ্গেই আমরা যেতে পারব।

তরঙ্গ বলিল, সতু আমাকে যেতে বারণ করছে জেঠিমা, বলছে নিজেও যাবে না, আমাকেও যেতে দেবে না।

হাসিমুখে সাধনাকে এ কথা বলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়াই তরঙ্গ গম্ভীর হইয়া গেল।

এমনিভাবে একই বংশের দু'টি শাখা কাছাকাছি আসিল, কিন্তু মিলিত হইল না। বীরেশ্বরের একটি পুত্রবধূ ষ্টোভ ধরাইতে হিসাব করিয়া স্পিরিটের উত্তাপটুকুর অপচয় পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন এবং একটি পুত্রবধূ বিষাদের বেহিসাবী প্ররোচনায় মুখে খাবলা খাবলা মাখিতে লাগিলেন দশ বোতল স্পিরিটের দামের এক কৌটা ক্রীম। বীরেশ্বরের একটি নাতির বাজেটে এক পয়সার পান খাওয়া হইয়া রহিল বিলাসিতার খরচ এবং একটি নাতি একটার পর একটা পুড়াইয়া চলিল দশটা পানের দামের সিগারেট।

যদি বীরেশ্বরের মনে কষ্ট না দিবার আদেশটাই শুধু অনুপমের বাবা দিয়া যাইতেন, যদি বলিয়া যাইতেন যে, বীরেশ্বরের একটি পয়সা যেন তাঁর বংশের কেউ গ্রহণ না করে, তবে হয় তো সাধনা বীরেশ্বরের তর্ক-বিতর্ক, আদেশ, অনুরোধ ও মিনতির মধ্যে অন্ততঃ শেষেরটাকে মানিয়া লইয়া উঠিয়া যাইতেন বীরেশ্বরের বাড়ীতে, আর হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে এলাইয়া পড়িতেন ফ্যানের তলার নরম শোফায়। কিন্তু এই স্বতন্ত্র পরিবারটি গড়িয়া উঠিয়াছে বীরেশ্বরকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জনীয় করিয়া রাখিবার প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে, এই পরিবারের মানুষগুলির মেরুদণ্ড সোজা হইয়া আছে চাওয়া-মাত্র বীরেশ্বরের টাকার যে ভাগ পাওয়া যায় সেই টাকার লোভ জয় করিবার সাধনায়, আজ কি সে সব বাতিল করিয়া দেওয়া চলে? শুধু মৃত স্বামীর হুকুম অমান্য করা নয়,

সাধনার পক্ষে ভোলা কঠিন যে, বিবাহের পর হইতে মন্ত্র জপের মত স্বামী তাকে শোনাইতেন, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই সাধনা, আর তোমার টাকার দরকার হয়, বাবার কাছে হাত-পাতার বদলে তুমি অসতী হয়ে যেও, তোমার রূপ আছে, কলকাতা সহরে বড়লোকও আছে অনেক। কি কুৎসিত কথা! কিন্তু কি আবেগের সঙ্গে কথাগুলি তিনি বলিতেন! স্বামী যে পাগলাটে ছিলেন, সাধনা তা জানেন। যে উন্মাদিনী জননীর হাতে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, তাতে পাগলাটে হওয়ার বদলে একেবারে যে পাগল হইয়া যান নাই তিনি, তাই আশ্চর্য্য!

তা ছাড়া, কি হইবে বেশী টাকা দিয়া? এ তাদের নিজের বাড়ী, সুতরাং থাকার ভাবনা নাই। যে টাকা হাতে আছে, সে টাকা শেষ হওয়ার আগেই অনুপম টাকা আনিতে পারিবে।

প্রথমে আসা-যাওয়া একটু বেশী ছিল, তারপর গেল কমিয়া। বীরেশ্বর দু'চার দিন পরে পরেই গাড়ী লইয়া আসিতেন, খানিকক্ষণ এ-বাড়ীতে থাকিয়া সকলকে লইয়া যাইতেন নিজের বাড়ী। সেখানে রান্নাবান্নার আয়োজন সেদিন হইত খানিকটা উৎসবের মত, বীরেশ্বরের সভাপতিত্বে সকলে একসঙ্গে বানাইত কথা গল্প হাসি আনন্দের সভা,

মনে হইত সত্যই যেন মিলনোৎসব। কিন্তু এক তরফা যাওয়া আর আসা সাধনা কতদিন চালাইবেন? অথচ বীরেশ্বরের বাড়ীর সকলে আসিলে যে রকম খরচ করিতে হয়, ঘন ঘন সে রকম খরচ করিবার ক্ষমতাও সাধনার নাই। তা ছাড়া, বীরেশ্বরের বাড়ীতে দুটি পরিবারের মিলনে যত হাসি-আনন্দই সৃষ্টি হোক, বার বার এ কথা কার না মনে পড়িতে থাকে যে, এবাড়ীতে যাদের চিরদিন এ-বাড়ীরই লোক হইয়া বাস করিবার কথা তাহারা বেড়াইতে আসিয়াছে সাময়িক অতিথির মত এবং তাহারা আসিয়াছে বলিয়াই এ বাড়ীতে আজ এই অতিরিক্ত হাসি-আনন্দের সৃষ্টি? এদিকে সাধনার বাড়ীতে আসিয়া বীরেশ্বরের বাড়ীর সকলে নড়াচড়া করিবার স্থান পায় না, বাড়ীতে যেন জনতার সৃষ্টি হইয়াছে! সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয় শঙ্করের মার। সাতাশ টাকার চেয়ে কম দামী সাড়ী পড়িয়া বাড়ীর বাহির হইলে তার বিষাদের সঙ্গে মিশিয়া যায় মাথা-কাটা-যাওয়া লজ্জা অথচ সাতাশ টাকার সাড়ী যে তাকে ভেংচায় এ অনুভূতিটা অন্য সব যায়গায় অস্পষ্ট থাকিলেও সাধনার বাড়ীতে ঢোকা মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরেই আর যেন সহ্য হইতে চায় না সাতাশ টাকার সাড়ী দিয়া নিজেকে নিজের ভেংচানো।

বড় মাথা ধরেছে দিদি। কাপড়টা ছেড়ে ফেলি, কেমন? মাথা ধরার সঙ্গে কাপড় ছাড়ার সম্পর্কটা বুঝিবার

চেষ্টা না করিয়া সাধনা তাকে নিমির একখানা সাড়ী দেন। নিমির সাড়ী পরিয়া আরও বিপদ হয় শঙ্করের মার, নিজেকে ভিখারিণী মনে করিবার যে অনুভূতিটা প্রায় সব সময়েই স্পষ্ট হইয়া থাকে তার মনে, সেটা হইয়া উঠে উগ্র এবং নিজেকে নিজের ভেংচি কাটার চেয়েও অসহ্য।

আমার শরীর কেমন করছে দিদি। আমি বরং বাড়ী চলে যাই। যাব?

একটু শোবে? শুয়েই থাক একটু।

কিন্তু শোবার সঙ্গে মনের বিকারের সম্পর্ক নাই। অবস্থা-বিশেষে বরং কষ্ট তাতে আরও বাড়ে। শরীর ভাল নয় বলিয়া শঙ্করলালের মা শুইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া সকলে কমবেশী ব্যস্ত হয়, কি হইয়াছে, কেন হইয়াছে, এখন কেমন লাগিতেছে শরীর, এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সাধনার বিছানায় শুইয়া শঙ্করলালের মার যেন নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। ছি! সকলকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন তিনি! এর চেয়ে মরাও যে তাঁর ভাল?

শঙ্করলাল এ বাড়ীতে আসে একটা অদ্ভুত নিয়মে। আসে সে একা এবং পর পর তিন চার দিন আসিয়া আট দশ দিন একেবারে আসে না। মনে হয়, পর পর তিন চার দিন আসিলেই এ বাড়ীতে আসিবার সখ তার মিটিয়া যায় এবং আট দশ দিন না আসিলে এ বাড়ীতে আসিবার এমন একটা সখ তার জাগে যে, পর পর তিন

পার দিন আসিয়া সে সখটা তাকে মিটাইতে হয়। প্রথম দিন শঙ্করলালের মুখ দেখিয়া হাসিভরা মুখখানা তরঙ্গ গম্ভীর করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন মমতাময়ী রাজরাণীর মত শঙ্করলালের ছেলেমানুষী দৃষ্টিপাতকে ক্ষমা করিয়া হাসিমুখেই সে কথা বলে।

দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

পরীক্ষা আসছে যে।

পড়ে পড়ে রোগা হচ্ছেন? বেশ! এ রকম রেটে রোগা হয়ে চললে পরীক্ষা পর্য্যন্ত টিকবেন তো?

শ্লেষ নয়, শ্লেষ তরঙ্গ জানেও না, শ্লেষ তার মুখে মানায় না। স্নেহ করিয়াই সে কথাগুলি বলে। কিন্তু সেবার শঙ্করলালের এ বাড়ীতে না আসিবার আট দশ দিনের মেয়াদটা বাড়িয়া পনের দিনে গিয়া দাঁড়ায়। পনের দিন পরে আবার যখন সে আসে, দেখা যায় সে আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তরঙ্গ আর তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলে না। শঙ্কর-লালও এ বাড়ীতে আসিবার মেয়াদটা সেবার বাড়াইয়া করে চারদিন।

সতু মাঝে মাঝে আসে আর দু'একদিন এ-বাড়ীতে থাকিয়া যায়। আসিতে সে চায় প্রত্যেক দিন এবং আসিয়া থাকিয়া যাইতে চায় চিরদিনের জন্য, কিন্তু রোজ তাকে কেউ আনেও না, দু'একদিনের বেশী এ বাড়ীতে থাকিতেও দেয় না।

আসেন না শুধু শঙ্করলালের বাবা রামলাল। তিনি আদালতে ওকালতি করেন আর এখানে-ওখানে মদ খান।

বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন, নিজের ঘরে থাকেন একা। বাড়ীর লোককে তিনি বিরক্ত করেন না, বাড়ীর লোকও তাঁকে বিরক্ত করে না। বীরেশ্বরের সঙ্গে মাসে তাঁর যে কটি কথার আদান-প্রদান হয়, তা বোধ হয় আঙ্গুলে গুনিয়া ফেলা যায়।

রাত ছুটোর সময় বড়ী ফিরিয়া রামলাল যদি দেখিতে পান যে শঙ্করলাল পড়িতেছে, স্থির পদে হোক, টলিতে টলিতে হোক, রামলাল তখন একবার ছেলের ঘরে যান।

বলেন, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড় শঙ্কর।

শঙ্করলাল বিনা বাক্যব্যয়ে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়ে।

## তৃতীয় অধ্যায়

পরীক্ষার জন্য কে যে বেশী রাত জাগে জহরলাল না অনুপম, ঠিক করিয়া বলা শক্ত। সাধ দুজনেরই সমান উগ্র, স্বপ্ন দুজনেরই সমান জটিল। শঙ্কর হইবে বিদ্বান্ আর অনুপম হইবে বৈজ্ঞানিক। জগতে তাদের তুলনা যদিও থাকে, অমর কীর্তি থাকিবে দুজনেরই, এতবড় হইবে দুজনেই যে, শ্রদ্ধায়, ভয়ে বিস্ময়ে মানুষ থ' বনিয়া থাকিবে।

শঙ্করের পরীক্ষাই শেষ হইয়া গেল আগে, গরমে ও গুমোটে ভাপসা একটা দিনের মাঝামাঝি। শেষ প্রশ্নের জবাবটা লিখিয়া তরঙ্গ ছাড়া এ জগতে আর কেউ নাই মনে হওয়ায় মনটা কেমন যেন তার হইয়া গেল বিভ্রান্ত। বাড়ী খালি পড়িয়া আছে জানিবামাত্র চোরের যেমন মনে হয় ভারি একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই রকম মনে হইতে লাগিল শঙ্করের। রোজ কি মানুষ এত স্পষ্টভাবে অনুভব করার সুযোগ পায় যে, তরঙ্গ ছাড়া পৃথিবীটা যখন ফাঁকা অথবা ফাঁকি, তরঙ্গকে তখন অবশ্যই পাওয়া দরকার?

অনুপমদের বাড়ী পৌঁছিতে বেলা চারটা বাজিয়া গেল। প্রথামত কলতলায় তরঙ্গ বাসন মাজিতে বসিয়াছিল, ছাই-মাখা হাতে উঠিয়া আসিয়া কনুয়ের ঠেলায় সে খুলিয়া দিল সদরের খিল। তারপর শঙ্করের সিল্কের জামায় ছাই লাগা

বাঁচানর জন্য তাকেও ঠেলিয়া দিল কনুই দিয়াই। তাতে জামায় ছাই লাগা বাঁচিল বটে, আবেগের সঙ্গে তরঙ্গের হাত চাপিয়া ধরায় দুহাতেই কিন্তু শঙ্করের ছাই লাগিয়া গেল।

তরঙ্গ বলিল, মনে হচ্ছে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শঙ্করের শীর্ণ দেহ, বিবর্ণ মুখ আর উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি দেখিলে মনে হয়, শুধু মাথা নয়, দেহের সমস্ত কলকব্জাও যেন তার খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথম যেদিন প্রায় এমনি সময় অনিচ্ছার সঙ্গে সে এ বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল, সেদিনের সঙ্গে তাকে আজ মিলাইয়া না দেখিলেও সন্দেহ হয়, ইতিমধ্যে ভয়ানক একটা অসুখে সে ভুগিয়াছে। পরলোকে না গিয়া এ বাড়ীতে তরঙ্গের ছাই-মাখা হাত চাপিয়া ধরিতে সে যে আসিতে পারিয়াছে, তাই পরমাশ্চর্য্য। তবে কথা শুনিলে আর ভাবভঙ্গী দেখিলে বোঝা যায়, পরলোকের কোন একটি অগ্রদূত, সোজা কথায় যাদের লোকে ভূত বলে, এখনও তার ঘাড়ে চাপিয়া আছে।

তরঙ্গ ভাবিয়া-চিন্তিয়া শঙ্করকে বাড়ী হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিল। বলিল, আপনি বাড়ী যান। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, কটা দিন এখন সময়মত নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে নিজেকে সামলে নিন গিয়ে। তখন বুঝতে পারবেন আজ কি রকম পাগলামি করছেন।

শঙ্কর ভালবাসা জানাইতেও জানে না, কেউ ভালবাসে কিনা বুঝিতেও জানে না। তরঙ্গের কথাও সে তাই বুঝিতে

চায় না, কিছু জানিতেও চায় না। ফাঁকা উঠানে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে এমন সব কথা বলিতে থাকে যে, আসল কথাটা বুঝিলেও কথাগুলি তরঙ্গের মাথায় ঢোকে না। শেষ পরীক্ষা দিয়া সে যে আজ বাড়ী ফেরে নাই, এই গরমে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,—এইটাই নাকি তরঙ্গকে সে যে ভীষণ ভালবাসে, তার অকাট্য প্রমাণ।

তরঙ্গ সায় দিয়া বলে, তাই তো বলছি বাড়ী যান, বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন গে।

শঙ্কর এসব কথা শুনিতে আসে নাই, তরঙ্গের কথা সে কানেও তোলে না, নিজের পক্ষেই ওকালতী করিয়া চলে ক্রমাগত। তরঙ্গের জন্য তার পড়ার ক্ষতি হইয়াছে, তরঙ্গের জন্য সে ভাল লিখিতে পারে নাই, তরঙ্গের জন্য সে বড় কষ্ট পাইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষতির পূরণ হিসাবেই সে যেন তরঙ্গের হাত দুটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে, কোনদিন ছাড়িয়া দিবে না। তরঙ্গ একবার হাত ছাড়িয়া দিবার দাবী জানায়, হয় তো শঙ্কর সেই অনুরোধ শুনিতে পায়, হয় তো পায় না, হাত এক ভাবেই ধরা থাকে। তরঙ্গের মুখ তাতে গম্ভীর হইয়া যায়। তাকে ভালবাসা জানাইতে আসিয়া তাকেই শঙ্কর অবহেলা করিতেছে, একটা কথা শুনিতেছে না, কেবল এইজন্য নয়, কোন অবস্থাতেই কারও অবহেলা তরঙ্গ সহ্য করিতে পারে না।

হাতটা ছেড়ে দিতে বলছি, শুনতে পাচ্ছেন? গায়ে তো জোর নেই একফোঁটা, এত জোর খাটাচ্ছেন কেন?

জোর খাটাচ্ছি?

তা নয়? থাকলে জোর খাটাতেন মানাত, এদিকে কাঁপছেন ঠক ঠক করে, কিন্তু হাত ধরেছেন এমন ভাবে যেন আমার সঙ্গে কুস্তি করবেন। চলুন তো বারান্দায় ছায়াতে যাই, শুনি আপনার কি বলবার আছে।

তরঙ্গের ধমকে মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছিল শঙ্করের, এবার তরঙ্গই তার হাত ধরিয়া একটা জড় বস্তুকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার মত বারান্দায় লইয়া গেল। একটা টুল দেখাইয়া হুকুম দিল, বসুন।

হুকুম-পালনে দেরী দেখিয়া শঙ্করের সিল্কের জামার জন্য যেটুকু মমতা তরঙ্গের ছিল, তাও যেন এবার উপিয়া গেল। দুই কাঁধে ছাই-মাখা হাত রাখিয়া জোর করিয়া শঙ্করকে সে বসাইয়া দিল টুলে, তারপর কলতলায় গিয়া একটা মাজা গেলাসের সঙ্গে ধুইয়া ফেলিল হাত। গেলাসে ঠাণ্ডা জল ভরিয়া আনিয়া বলিল, জল খেয়ে নিন, গলায় কথা আটকে যাচ্ছিল। তারপর বলুন তো এতক্ষণ কি বলছিলেন, ভাল করে গুছিয়ে বলুন।

বুঝতে পার নি?

কেন বুঝব? এত বয়সে একটা মেয়েকে দুটো মনের

কথা জানাতে যে ছেলে হিমসিম খেয়ে যায়, তার আবোল-তাবোল কথা বুঝেও বুঝতে নেই।

শঙ্কর এবার রাগ করিয়া বলিল, তোমার মত বয়সে যে মেয়ে এমন করে কথা বলতে পারে, তাদের ঘেন্না করতে হয়।

রাজরাণীর মত যে বাসন মাজিতে পারে, এত সহজে তাকে কাবু করা যায় না। তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আলাদা কথা।

তুমি পাগল তরু।

কে পাগল, আমি? কিসে পাগল হলাম? আপনার সঙ্গে সমান তালে পাগলামি করছি না বলে?

জহর ক্ষেপিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া তরঙ্গ তাড়াতাড়ি বিনয় করিয়া বলিল, আমার কথা বাদ দিন। আপনার কথা হচ্ছিল, তাই হোক। একটা কথা শুনবেন আমার? আজ বাড়ী চলে যান। আজ যা বলতে চাইছিলেন মাসখানেক পরে এসে বলবেন। এ ক'দিন সময়মত নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে সুস্থ হলেই দেখবেন, নিজেই চমৎকার বুঝতে পারছেন কত সহজ একটা ব্যারামকে কি রকম ঘোরালো করে তুলছেন।

গ্রামোফোন বাজার মত নির্ভুল, পরিবর্ত্তনহীন উপদেশ। শঙ্করের মনে হয় গ্রামোফোনের হৃদয় না থাক, এমন নির্লজ্জ হওয়ার ক্ষমতা গ্রামোফোনেরও নাই।

তোমার খুব মজা লাগছে, না?

তরঙ্গ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, দুঃখ হচ্ছে।

এগ্‌জামিনের চাপে আপনার মত ছেলে এ রকম হয়ে যেতে পারেন ভাবলে আমার বড় কষ্ট হয়।

.নভেল পড়ে পড়ে তোমার মত মেয়ে এরকম বেহায়া হয়ে যেতে পারে ভাবলে আমারও কষ্ট হয়।

দুজনেরই যখন কষ্ট হচ্ছে, আপনি বাড়ী যান।

বাড়ী গিয়ে সময়মত নেয়ে খেয়ে ঘুমোব ত ?

আকাশের দেবীকে মানুষের অপমান করার চেষ্টার মত শঙ্করের খোঁচা-দেওয়া প্রশ্ন কোন কাজে লাগিল না, অনেক চেষ্টায় কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব যেন শিষ্যের মাথায় ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছে এইরকম ভাবে খুসী হইয়া তরঙ্গ বলিল, নিশ্চয়। শরীর মন সুস্থ হলে আসবেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আজকের কথা ভেবে যেন আবার পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না লজ্জায়।

উঠানে নামিয়া গিয়া শঙ্কর বলিল, আর কোন দিন তোমাদের বাড়ী আসব না।

তরঙ্গ বলিল, এটা আমার বাড়ী নয়।

গলিটা নূতনত্ব পাইয়াছে, গলির শেষে রাজপথের পারিপার্শ্বিকতায় আবির্ভাব ঘটিয়াছে অভিনবত্বের। দেওয়ালে মাথা ঠোকার চেয়ে হয় তো কিছু বেশী সময় লাগিয়াছে তরঙ্গকে প্রেম নিবেদন করিতে, ফলটা হইয়াছে একই রকম। জগৎটা

গিয়াছে বদলাইয়া। জগৎ যে মানুষের মাথায় থাকে এতদিন কি জহর তা জানিত? পথ চলিতে চলিতে জহর অনুভব করিতে লাগিল সে হঠাৎ মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে; কারণ পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন মনে হইতেছিল যে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনটাও শেষ হইয়া গিয়াছে, তরঙ্গের খাপছাড়া প্রত্যাখ্যানের পর এখনও ঠিক সেইরকম মনে হইতেছে এবং এটুকু বুঝিতে আর তার বাকী নাই যে, পরীক্ষার সঙ্গে জীবন শেষ হওয়ার অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও অর্থহীন অনুভূতিটাকেই শুধু স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে তরঙ্গ, আর কিছু নয়।

কে তরঙ্গ? কেউ নয়! জগৎ কি? মস্তিষ্কের কেমিক্যাল রিএ্যাক্সন। জীবন কি? যা মনে করা যায় তাই।

অতএব কষ্ট পাওয়ার কোন কারণ নাই। তবু অকারণে এ রকম কষ্ট সে পাইতেছে কেন? আস্তে হাঁটার জন্য? জোরে হাঁটে জহর, কোন লাভ হয় না। শরীরের খানিকটা ঘাম শুধু বাহির হইয়া যায়। তৃষ্ণা পাইয়াছে বলিয়া? পানের দোকানে ডাব খাইয়া তৃষ্ণা মেটানর সঙ্গে একবার রোমাঞ্চ হয় জহরের, জগৎ-ঠাসা মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়, শব্দটা পর্য্যন্ত জহর যেন শুনিতে পায়। তরঙ্গের কাছে আমল না পাওয়ায় ভিতরে যাই ঘটুক সেটা তবু বোধগম্য ব্যাপার, এ সমস্ত কোন্ দেশী প্রতিক্রিয়া? হাতে এখনও ছাই লাগিয়া আছে। খানিকটা ডাবের জলেই জহর হাত ধুইয়া ফেলিল। এও এক ধরণের

রসিকতা তরঙ্গের, নিজেকে দেওয়ার বদলে খানিকটা ছাই দিয়াছে। কি সয়তান মেয়েটা, কি চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছে মানুষ-ঠকান বিদ্যা !

বন্যার মত তরঙ্গের সয়তানী পৃথিবী ভাসাইয়া দিয়াছে। পানওয়ালা পর্য্যন্ত টাকার ভাঙ্গানিতে একটা অচল সিকি চালাইবার চেষ্টা করে, তরঙ্গের জন্য জহরের যেন অচল সিকি চেনার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। গাল দেওয়ার পর পান-ওয়ালার অন্যায় রাগ দেখিয়া একটা চড়ও জহর তাকে মারিয়া বসে। তাতে কিছুক্ষণের জন্য একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তা হোক, ব্যাপারটা যে অন্ততঃ স্বাভাবিক তাই জহরের ঢের। তা ছাড়া দামী জামা-কাপড়-পরা ভদ্রলোক পানওয়ালাকে গাল দিয়া চড় মারিলে ব্যাপার আর কতদূর গড়াইতে পারে ? একটু হৈ-চৈ হইয়াই শেষ।

যে দিকের ফুটপাথে রোদ পড়িয়াছে সে দিক দিয়াই খানিক-ক্ষণ হাঁটিবার পর জহরের খেয়াল হয়, এতক্ষণে মনটা বেশ শান্ত হইয়াছে। ভয়ানক কিছু একটা করিবার জন্য ছটফট অবশ্য করিতেছে মনটা, তবু এতক্ষণ যেমন বিভ্রান্ত হইয়া ছিল, তার তুলনায় একেবারে জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আর ভাবনা নাই, এবার সে ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারিবে, কোন কারণে এতটুকু উত্তেজনা জাগিবে না, অবসাদ প্রশ্রয় পাইবে না, কথায় ব্যবহারে সহজ সৌম্য ভাবটি অনায়াসে বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে।

এই অবস্থা ফিরিয়া পাইলে তরঙ্গ তাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিল, না ? কয়েকদিন সময়-মত নাওয়া-খাওয়া-ঘুমের বদলে মনের জোরে আধঘণ্টার মধ্যেই যদি সে নিজের এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে, তাতে কি বলার আছে তরঙ্গের ? যদি কিছু বলার থাকে, বক্তব্যটা শুনিয়া আসিতেই বা দোষ কি ? এসব ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল। কোন্ কথার জবাবে তরঙ্গ কি বলিয়াছিল, কি কথা বলিবার ভঙ্গীতে তরঙ্গ কি ইঙ্গিত করিয়াছিল, এসব কিছু কি সে লক্ষ্য করিয়াছে ? আগাগোড়া হয়ত ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে তরঙ্গকে। হয়ত খেলা করিতেছিল তরঙ্গ। এই গরমে বাসন মাজা কাজটা তো মধুর নয়, সেই কাজের মাঝখানে তাকে পাইয়া হয় তো একটু মাধুর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল,—এখন মনে মনে বুক চাপড়াইয়া আপশোষ করিতেছে। বড় বড় চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ছাই-মাখা বাসনে ঝরিয়া পড়িতেছে তার চোখের জল। মেয়েদের কথার আড়ালে যে-সব কথা থাকে তার একটাও যে লোকটা ধরিতে পারে না, তার বোকামির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ের হয়তো অন্ত থাকিতেছে না তরঙ্গের। 'আজকের কথা ভেবে লজ্জায় যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না' এই অনুরোধের আসল মানে সে বুঝিতে পারিবে কি না ভাবিয়া দুর্ভাবনায় বুক হয় তো দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে তরঙ্গের, আরও স্পষ্ট ভাবে কথাটা তাকে বুঝাইয়া না দেওয়ার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে।

বুক যে আবার টিপ্ টিপ্ করিতেছে, সে জ্ঞান শঙ্করের রহিল না, গালে চড় মারা পানওয়ালার দোকানের সম্মুখ দিয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় সেই দোকান হইতেই এক প্যাকেট সিগারেট সে কিনিয়া লইল, পানওয়ালা যে এতক্ষণে তার পাগলামির হদিস পাইয়াছে, সেটুকু বুঝিতে পারিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, জোরে হাঁটিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভাড়া করিল একটা রিক্সা।

এবার দরজা খুলিল অনুপম। কোন্ চুলায় সে গিয়াছিল কে জানে, এইটুকু সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। তরঙ্গকে আর একা পাওয়ার উপায় নাই। তরঙ্গ বাসন মাজা শেষ করিয়া কলসীতে জল ভরিতেছিল, শঙ্করকে দেখিয়া কিছু বলিল না।

অনুপম সলজ্জ বিব্রত ভাবে বলিল, তোমার সঙ্গে তো কথা বলতে পারব না ভাই, কাল আমার ফিজিক্স হবে। একদিনে দু' পেপার।

একটু হাসে অনুপম। হাত কচলায়। রাত কি সেও কম জাগিয়াছে।

শঙ্কর বলিল, না না, তুমি পড়বে যাও।

পড়ার ঘরে গিয়া অনুপম খিল দেয় বটে, তরঙ্গকে কিন্তু একা পাওয়া যায় না। উপর হইতে নামিয়া আসেন সাধনা, নীচের তলার একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে নিমি। সাধনা শঙ্করকে বসিতে বলেন, নিমি আব্দার করিয়া বলে, ষ্টোভটা ধরিয়ে দেবেন শঙ্করদা?

তাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাধনা বলেন, ওরকম প্যান প্যান করে কথা বলিস না নিমি, বিচ্ছিরি শোনায়। তুই ধরাতে পারিস না ষ্টোভ? শঙ্করকে কেন?

শঙ্করদা ভাল পারেন।

সাধনা এ কথায় আরও অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, শঙ্করদা বলতে না তোকে বারণ করেছি নিমি? তাও এমন করে বলিস যেন ওর নামটা নিয়ে তামাসা করছিস। অনুর চেয়ে শঙ্কর বড়, ওকে বড়দা বলিস।

এদিকে কলসী ভরিয়া যায় তরঙ্গের, কিন্তু চোখে জল কই তার, যে জলের টপ, টপ্ করিয়া মাজা বাসনে পড়া উচিত ছিল? চোখ পর্য্যন্ত ছল ছল নয়, মুখ পর্য্যন্ত ম্লান নয়। তাকে দেখিয়া একটু চাপা হাসিও যদি তরঙ্গ হাসিত! একটু আড়চোখেও অন্ততঃ যদি সে চাহিত বারেকের জন্য!

জলের কলসী তুলিয়া রাখিয়া তরঙ্গ কি কাজে যেন উপরে গেল, সাধনা কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রশ্নটা কানে না তুলিয়া গোঁয়ারের মত শঙ্করও তার পিছু পিছু দোতালায় উঠিয়া গিয়া বোকার মত জিজ্ঞাসা করিল রাগ করেছ নাকি?

তরঙ্গ বলিল, আপনাকে না বাড়ী যেতে বলেছিলাম?

শঙ্কর আত্মপ্রতিষ্ঠ-ভাবের অভিনয় করিয়া সহজ ভাবে বলিল, তা বলেছিলে।

কেন তবে আমাকে জ্বালাতন করছেন?

জ্বালাতন করছি ?

এত করে বোঝানর পরও তা মাথায় ঢোকে নি ? আপনি কি হাবা ? এত সোজা একটা কথা, তাও কি মাথায় লাঠি মেরে না বোঝালে বুঝতে পারেন না ? কেন যে আপনারা পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মান ! জানেন, আপনাদের জন্যে দেশটা রসাতলে গেল।

আরও অনেক কথা। তরঙ্গ যে বক্তৃতাও দিতে জানে, মেয়ে হইয়াও সে যে মেয়ে নয়, সে আজ মরিয়া গেলেও যে তরঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না, এই ধরণের অনেকগুলি সত্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর আবার নামিয়া আসিল পথে। মাথার জগৎটা এবার বাহিরে আসিয়াছে, ছোট ছোট চৌকা ঘর-কাটা ফুটপাথে পানের পিক, নোংরা জল, ছেঁড়া কাগজ, চেঁড়া পাতা, কুকুর, মানুষ, গরু, ঘোড়া, গাড়ী, বাড়ীঘর, আকাশ, যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তের মধ্যে, কারণ জগৎটা তাই,—মাথাব ফাঁকির খেলার মধ্যেও বাহিরে সব কিছু থাকার রহস্য। শঙ্করের কি আর বুঝিতে বাকী আছে, বাস্তবতা কাকে বলে ? তরঙ্গ ঠিক বলিয়াছে, মানুষ হইয়া যে একজন দু'জন মানুষের জন্য কাঁদে, সে অমানুষ। কাঁদিতে যদি হয়তো বৃহত্তর কোন কিছুর জন্য কাঁদা উচিত, সে কান্নাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ, আর সব ন্যাকামি। আরও যেন কি সব বলিয়াছে তরঙ্গ। বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় বড় করিয়া তরঙ্গ যত বড় বড় কথা বলিয়াছিল, ইতিমধ্যে প্রায় তার সমস্তই

ভুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এত বই পড়িয়া এত কথা এতকাল ধরিয়া মনে রাখিতে পারিয়াছে, শুধু তরঙ্গের কথাগুলি দশ মিনিটের মধ্যে ভুলিয়া গেল? সে যে অপদার্থ তাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কে অপদার্থ নয়? দৃষ্টিতে যেন তার নূতন একটা রশ্মি সঞ্চারিত হইয়াছে, মানুষের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া একেবারে ভিতরটা খানাতল্লাস করিবার শক্তি জন্মিয়াছে,—এমন কি, একশ' দেড়শ' গজ দূরে দাঁড়াইয়া যে লোকটা চুরুট টানিতে টানিতে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তার ভিতরটা পর্য্যন্ত শঙ্করের দৃষ্টির আলোতে সুস্পষ্ট। লোকটার কাছাকাছি যাইতে যাইতে ট্রাম আসিয়া পড়িল, শঙ্করও উঠিয়া পড়িল ট্রামে। ট্রামের দেশী আর বিদেশী আর দেশী-বিদেশী নরনারীগুলিও সব অপদার্থ। কারও মুখে মনুষ্যত্বের ছাপ নাই, বৃহত্তর মহত্তর কিছুর জন্য কাঁদা দূরে থাক, দু'একজন মানুষের জন্য পর্য্যন্ত তারা কেউ কাঁদিতে রাজী কি না সন্দেহ, ট্রামের টিকিট কেনার পয়সা খরচ করার দুঃখ সহ্য করিতেই যেন সকলের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা শঙ্করের ছিল না। তবু বাড়ী ফিরিতে হইলে একটা পার্কের যে কোণে নামিয়া তাকে বাসে উঠিতে হইবে, সেইখানে সে নামিয়া পড়িল। পার্কে একটা সভা হইতেছে, সভায় না ঢুকিয়াই বোঝা যায় দেশের নামে দেশের লোকের সভা, কারণ, সমগ্রভাবে সভার চেহারাটা কুড়ানো আবর্জ্জনার স্তূপের মত,—হুজুগের ঝাঁটা

অকেজো, ফেলনা কতকগুলি মানুষকে একত্র করিয়াছে। তরঙ্গের সঙ্গে সমস্ত জগৎ তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ভিতরে এই রকম একটা অনুভূতির প্রাবল্য থাকায় ভাঙ্গাবাড়ীর পুরানো ইট-পাটকেলের স্তূপের মত এতগুলি মানুষের ভিড়ের জন্য শঙ্কর একটু আকর্ষণ বোধ করিল। পার্কে ঢুকিয়া সে মিশিয়া গেল ভিড়ে। লোক বড় কম জমে নাই, হাজার তিনেক হইবে বোধ হয়। বাহির হইতে সভার যে বৈশিষ্ট্য জহরের চোখে পড়িয়াছিল, ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল আশেপাশে যে ক'জনের মুখ ভাল করিয়া দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকের মুখে সেই বৈশিষ্ট্যেরই ব্যক্তিগত ছাপ। বেশ বোঝা যায়, কেউ আপিস হইতে ফেরার পথে বিনামূল্যে একটু বৈচিত্র্য সংগ্রহ করিতেছে, কেউ উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়ান স্থগিত রাখিয়া ভিড়ে মিশিয়াছে, কেউ নিদারুণ আত্মগ্লানিকে একটু ফাঁকি দিবার আশায় দেশের জন্য আহুত সভায় যোগ দেওয়ার মত মহৎ কাজের আত্মপ্রসাদ-টুকু লাভ করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে এই ভাবে সভায় সভায় উচ্ছ্বাসের রোমাঞ্চ ও শিহরণ পাওয়ার নেশা মিটাইতে! ডাইনের বুড়ো মানুষটি ক্রমাগত মাথা নাড়িয়া যাইতেছেন, মুদ্রাদোষের জন্য অথবা বক্তৃতায় সায় দিবার জন্য বোঝা যায় না। বাঁ দিকের প্রৌঢ় লোকটি বোবা-হাবার মত প্রায় হাঁ করিয়াই চাহিয়া আছেন বক্তৃতামঞ্চের দিকে, মনে হয়, বক্তৃতার যে কথাগুলি তাঁর কানে ঢুকিয়াছে, তাঁর মানে বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে বক্তার এখনকার কথাগুলি কানে ঢুকাইয়া

চলিয়াছেন। সামনের যুবকটি বোধ হয় যৌবনচর্চ্চার ফলেই নিজের দেহে বাস করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু দেশে বাস করার অধিকারটুকু বজায় রাখার জন্য সভা ছাড়িয়া চলিয়াও যাইতে পারিতেছে না।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া মানুষগুলিকেই শঙ্করের দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে জোর করিয়া চোখ রাখিয়া সে বক্তার কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল, সে যেন তরঙ্গের কথা শুনিতেছে। তরঙ্গই যেন পুরুষ সাজিয়া গলা মোটা করিয়া মঞ্চে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, আর সমস্ত কান্না ন্যাকামি, দেশের জন্য, দশের জন্য যে কান্না সেই কান্নাই আসল কান্না।

একেবারে বক্তৃতামঞ্চে গিয়া চড়াও হওয়ার খেয়ালটা শঙ্করের চাপিল দু'নম্বর বক্তাকে দেখিয়া। ভদ্রলোক শঙ্করের চেনা। তবে তিনি যে একা তারই চেনা নন, আরও অনেকেই যে তাঁকে চেনে, সেটা বোঝা গেল তিনি উঠিয়া দাঁড়ান মাত্র সভায় মৃদু একটা জয়ধ্বনি উঠায়। ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য্য মনে হইল শঙ্করের। বছরখানেক আগেও যিনি ফাঁকি দিয়া—সাধারণ জুয়াচুরির চেয়েও খারাপ আইনসঙ্গত জুয়াচুরি করিয়া—বীরেশ্বরের হাজার তিনেক টাকা মারিয়া দিয়াছিলেন, তাকে দেখিয়া জনতার উল্লাস? কাগজে সম্প্রতি একজন লীলাময় ঘোষের নাম দেখা যাইতেছিল বটে মাঝে মাঝে, তিনিই কি ইনি? পাশবালিশের মত গোলগাল লীলাময়ের এ তো এক অপরূপ লীলা!

মঞ্চে উঠিবার অধিকার শঙ্করের ছিল না, কিন্তু রাজসিংহাসনে উঠিবার অধিকারও শুধু অপেক্ষা রাখে অর্জ্জুনের। বাধা মানিবার মত মন তার ছিল না, বাধা সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল দু'হাতে, গম্ভীর মুখে একটু মাথা হেলাইয়া সমস্ত প্রতিবাদে সায় দিয়া বসিয়া পড়িল লীলাময় ঘোষেরই খালি চেয়ারটিতে। উদাস মধুর সজল কান্নার সুরে লীলাময় তখন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সুর যেমনই হোক থাকিয়া থাকিয়া এমন সব বিশ্রী হাসির কথা তিনি বলিতে লাগিলেন যে, সভায় চাপা হাসির গুঞ্জন উঠিতে লাগিল। বক্তৃতার এ একটা টেকনিক,—'কাঁদ' 'কাঁদ' গোপাল ভাঁড় মানুষকে মুগ্ধ করে বেশী।

একবার হাসিটা হইল প্রবল, মিনিটখানেক গোলমাল থামিল না। সেই অবসরে লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর শঙ্কর ?

আমি কিছু বলব।

বলবে ? আমাকে না সভায় ?

সভায়।

কি সর্ব্বনাশ ! ওসব দুর্ব্বুদ্ধি কোরো না।

লীলাময়ের বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র শঙ্কর বিনা ভূমিকায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, বন্ধুগণ, অনাহুত ভাবে আমি আপনাদের একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা ন্যাকামি ছাড়ুন। আপনারা সকলেই ন্যাকা। কেন জানেন ? আপনারা সকলে একের জন্য, দুয়ের জন্য, তিনের

জন্য কাঁদেন, দশের জন্য কাঁদেন না। আপনারা অমানুষ, পশু, অসভ্য, বর্ব্বর। আপনাদের লজ্জা করছে না এখানে বসে থাকতে ? ঘরের কোণের একজন দু'জন তিনজনের জন্য নিজেকে আপনারা উৎসর্গ করে দিয়েছেন জানোয়ারের মত, এই সভায় এসে ভিড় করবার কি অধিকার আপনাদের আছে ? আমি যদি বলি আপনাদের মাঝখানে এখন একটা বোমা ছুঁড়ে মারব, আপনারা যে যার প্রাণ নিয়ে আগে পালাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবেন, বড় জোর সঙ্গে নেবার চেষ্টা করবেন একজন দুজন কি তিনজনকে, অথচ এমন জমাট বেঁধে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, এমন গলাগলি মাখামাখি ভাব আপনাদের,—থামানর চেষ্টা, টানিয়া বসানর চেষ্টা, স্বয়ং সভাপতির উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রোতাদের ব্যাপারটা বুঝানর চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। চার পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যখন একসঙ্গে শঙ্করকে চাপিয়া ধরিল, সে গলা ফাটাইয়া শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরা আমায় বসিয়ে দিচ্ছেন, আপনারা আমার কথা শুনবেন না ?

গালাগালি-মুগ্ধ শ্রোতারা বলিল :

শুনব ! শুনব !

বেশ তো বলছিল বাপু, বলুক না।

এই ভলান্টিয়ার শালারা, ছেড়ে দে পাগলাটাকে।

বন্দেমাতরম্ !

আস্তে ! আস্তে ! বড় গোল হচ্ছে !

পাগলাটার নাম কি ?

বার করে দাও পাগলাটাকে—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দাও।

কি বলছিল, বলুক না শুনি।

চার পাঁচজন নেতার হাতগুলি মিনিট পাঁচেক শূন্যে আন্দোলিত হওয়ার পর গোলমাল একটু কমিল। তার পর লীলাময় উঠিয়া বুকের কাছে দুটি হাত একত্র করিয়া ধীরে ধীরে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বার সাতেক চারিদিকে পাক খাওয়ার পর গোলমাল থামিয়া গেল। তখন সভাপতি ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন যে, সকলে গোলমাল করিলে তো সভার কাজ হয় না, অতএব সকলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁর সবিনয় নিবেদন মন দিয়া শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। এই যে এই লোকটি বলা নাই, কওয়া নাই বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইনি কে কেউ তা জানে না, এ সভায় এঁর বক্তৃতা দিবার কোন কথা ছিল না, তা'ছাড়া এ সভা যে জন্য আহ্বান করা হইয়াছে তার সঙ্গে এ ভদ্রলোকের বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নাই, আর এভাবে যার যখন খুসী যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গেলে কোন সভার কাজ হয় না, তবু সভার সকলে যদি এই ভদ্রলোকের কথা শুনিতে চান, সভাপতি হিসাবে তিনি সকলের ইচ্ছার মর্য্যাদা রাখিয়া এঁকে বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি দিবেন, মুখে কিছু না বলিয়া যাঁরা এঁর বক্তৃতা শুনিতে চান যদি দয়া করিয়া হাত তোলেন—

হাত উঠিল অনেকগুলি এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে শঙ্কর সভায় বলিবার অনুমতি পাইল। এবার কিন্তু সে না পাইল কথা খুঁজিয়া, না পারিল উদ্ধত উন্মাদনার সঙ্গে

গগনভেদী চীৎকার করিতে। প্রত্যেকটা শব্দ যেন গলায় আটকাইয়া যাইতে লাগিল। একবার ভাবিল, উপস্থিত সকলকে আরেকবার জানোয়ার বলিয়া গাল দেয়, অন্ততঃ অমানুষ বলে। কিন্তু হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এতগুলি মানুষকে ওসব কথা বলিবার সাহস সে কোথায় পাইবে? ভদ্রভাবে নীচু গলায় জড়াইয়া জড়াইয়া কয়েক মিনিট কি যে সে বলিল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। তারপর আচমকা বক্তৃতা থামাইয়া বসিয়া পড়িল। দুই কানে তখন তার আগুন ধরিয়া গিয়াছে, মনে জাগিয়াছে সীতাদেবীর সেই সাধ, যে সাধের মর্য্যাদা রাখিতে প্রকাশ্য সভা-ভূমিতেই ধরিত্রী দ্বিধা হইয়া গিয়াছিলেন।

একসময় সভার কাজ শেষ হইয়া গেল। লীলাময় ডাকিতেই সে কলের পুতুলের মত তার পিছু পিছু দাড়িওয়ালা এক ভদ্র-লোকের প্রকাণ্ড গাড়ীতে গিয়া উঠিল। লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ব্যাপার কিছু বুঝলাম না বাপু, এরকম কেলেঙ্কারী করলে কেন?

শঙ্কর বোকার মত বলিল, কি জানি।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, তা ঠিক, জানলে কি আর করতে?

লীলাময় পরিচয় করিয়া দিলেন। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের নাম কেদারনাথ রায়, মফঃস্বলে কিছু জমিদারী আছে, কলিকাতায় কয়েকখানি বাড়ী আছে।

কাগজে মাঝে মাঝে নাম ভাখো না শঙ্কর? দেখবে কি, খবরের কাগজ কি আর পড়! হাতের কাছে যদি একখানা কাগজ পেলে ত' নারী-হরণ, সিনেমা আর খেলাধূলা সংবাদ পড়েই খতম। বেশ নাম হচ্ছে কেদারবাবুর, আর বছরখানেক বছর দুই যাক্, লোকের মুখে মুখে ওঁর নাম ঘুরবে। নেতা হওয়া কি সহজ? কত হিসাব করে কত ভেবে চিন্তে প্রত্যেকটি পা ফেলতে হয়। তোমার মত বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সভায় এসে গলাবাজী করলেই কি হয়! আজ তিন বছর ধরে কেদারবাবু কত চেষ্টা করেছেন, তবে আজ মিটিং-এ একটু খাতির পান।

আজ ত উনি কিছু বললেন না?

বললেন বৈ কি, সকলের আগে উনি বলেছেন। ওঁকে আগে বলতে দিতে একটু আপত্তি হয়েছিল, হিংসুটে লোকের ত অভাব নেই, সভার রিপোর্টে কাগজে আগে ওঁর নামটা বেরুবে, তাতেও লোকের গা জ্বলে। আমি কিন্তু ছাড়বার ছেলে নই বাবা, স্পষ্ট বলে দিলাম প্রথমে বলতে না দিলে উনি যে একশ' টাকা চাঁদার কথা বলেছেন সেটা ক্যানসেল হয়ে যাবে। শুনে সবাই চুপ।

কেদারনাথ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন,—একশো!

শঙ্কর দেখিতে পাইল কেদারের উরুতে আঙুলের খোঁচা দিয়া লীলাময় কি যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না।

লীলাময় খুসী হইয়া শঙ্করকে বলিলেন, কিন্তু তোমার কাণ্ড দেখে আমি কিন্তু থ' বনে গেছি ভাই। ইচ্ছাটা কি বলত ? এই বয়সে বড় হওয়ার সখ চেপেছে না কি ?

শঙ্কর ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, তবু গায়ের জোরে উদ্ধতভাব বজায় রাখিয়া বলিল, বড় হওয়ার সখ কোন বয়সে থাকে না ?

কিন্তু ও ভাবে কি বড় হওয়া যায় রে দাদা ! তার ধরা-বাঁধা মেথড্ আছে। এই যে এত কাণ্ড করলে, তুমি ভাবছ কাল কাগজে কাগজে তোমার নাম বেরিয়ে যাবে ? সে গুড়ে বালি।—এক লাইন শুধু লিখে দেবে, একজন পাগলাটে ইয়ংম্যান মিটিংএ গোলমাল করেছিল। তোমার নামটি পর্যন্ত করবে না।—কি করছ তুমি এখন ?

—কিছু না।

এ লাইনে আসবে ?

বলিয়া শঙ্করের জবাবের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই খুসীতে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিলেন, শঙ্করের হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, বেশ, কিছু ভেবোনা তুমি, আমার উপর সব ভার ছেড়ে দাও, আমি সব ঠিক করে দেব। কিন্তু সে তো দু'একদিনের ব্যাপার নয়, দু'এক কথাতে সব ঠিক হয়ে যাবে না। এক কাজ কোরো তুমি, কাল দুপুরবেলা একবার এস আমার বাড়ীতে—কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে। হ্যাঁ কেদারদা, এই সন্ধে বেলা বাড়ী ফিরে যাব ? কোথাও একটু কিছু—একজন ইয়ংম্যান সঙ্গে রয়েছে, আজ বেশ জমত। এ্যাঁ ?

কেদার বলিলেন, কনকের ওখানে—?

শঙ্কর আবার দেখিতে পাইল, কেদারের উরুতে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়া লীলাময় আবার কি যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না। একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় অনুভূতি শঙ্করের ভিতরে ম্যাজিকওয়ালার চারা-গাছের মত গজাইয়া উঠিতেছিল। জীবনে যেন হঠাৎ একটা রহস্যময় এ্যাডভেঞ্চার সুরু হইয়া গিয়াছে। কনক যে কে এবং কেন যে সে বাতিল হইয়া গেল বুঝিতে শঙ্করের বিশেষ কষ্ট হইল না। ছেলে সে কেমন, কনক নামধেয়ার স্ফূর্তির বাজারে সওদা কিনিতে যাওয়াটা সে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, এখনও লীলাময় তার হদিস পান নাই। চালাক-চতুর মানুষ, হিসাব না করিয়া এক পা চলেন না, কনককে তাই এখনকার মত আড়ালেই রাখিয়া দিলেন।

চৌরঙ্গীর এক হোটেলে গিয়া সামনে ধরিলেন শুধু একটা পেগ্। শুকনো নীরস জীবন মানুষের, কঠিন বাস্তবতার ধূ ধূ প্রান্তর পার হইয়া চলিতে হয় মানুষকে—হয় না ভাই শঙ্কর? বিষ—জীবনে শুধু বিষ। মাঝে মাঝে তাই একটু অমৃত চাই মানুষের—চাই না ভাই শঙ্কর?

শঙ্কর সায় দিয়া বলিল, নিশ্চয়।

বলিয়া এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করিয়া নিজের হাতে নিজের গলা চাপিয়া ধরিয়া শঙ্করের মুখ বাঁকানর রকম দেখিয়া লীলাময় ও কেদার দুজনেই হাসিলেন। কিন্তু গ্লাসে চুমুক সে যে দিয়াছে,

দলে সে যে ভিড়িয়াছে, ইহাতে পরম স্বস্তিও দুজনে যে পাইয়াছেন, সেটা বেশ বোঝা গেল।

কেদার বলিলেন, আনাড়ি।

লীলাময় রসিকতা করিয়া বলিলেন, নাড়ীজ্ঞান পাবে কোথায় দাদা, নাড়ী কি কখনও ধরেছ!

নাড়ীজ্ঞানী কেহ তখন শঙ্করের নাড়ী ধরিলে ভয়ে ভয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। ভিতরের জ্বালাটা কিসের বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। মাথাটাও ঝিম ঝিম করিতেছে। বিনা আয়োজনে, বিনা প্রয়োজনে আজ সন্ধ্যায় সে একি চমৎকার নবজীবন আরম্ভ করিয়া দিল! মিটিং-এর লীলাময়ের মুখোস এখনও খসে নাই, উপর হইতে একটা পর্দা সরিয়া গিয়াছে মাত্র। এখনও লীলাময়ের মুখ দেখিলে মনে হয়, রসে টইটুম্বুর একটা মানুষ কান্নার ভান-করা রসিকতায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। কেদার কি বক্তৃতা দিয়াছিলেন শঙ্কর শোনে নাই, লীলাময়ের কথাগুলি তার মনে আছে। এখন যে সুবাস বাসা বাঁধিয়াছে লীলাময়ের মুখে, মিটিং-এর কথাগুলির সঙ্গে সেটা মিশিয়া থাকিলে না জানি আরও কত শ্রুতিমধুর হইত তার বক্তৃতা, আরও কত মুগ্ধ হইয়া যাইত সভার লোক! ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

লীলাময় গদগদ হইয়া বলিলেন, এন্‌জয় করছ? দাঁড়াও দাঁড়াও, এই সবে সন্ধে!

তাই কি? জীবনের এটা কোন্ তিথির সন্ধ্যা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। এমনি সাধারণ তিথিটা আজ কি ছিল, শঙ্কর তাই মনে করিবার চেষ্টা করিল। পূর্ণিমার কাছাকাছি হইবে, হয় এদিক নয় ওদিক। মনটা কেমন করিতে লাগিল শঙ্করের। পরীক্ষার পড়া করিতে করিতে কতবার জানালা দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্না দেখিয়া, ছাদে হোক, মাঠে হোক, ঘাটে হোক জ্যোৎস্নায় চুপচাপ অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার যে সাধটা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত, কত কষ্টে পরীক্ষা শেষ হওয়ার জন্য সাধটা সে তখন সঞ্চয় করিত! হোক না ছেলেমানুষী, এসব চিরন্তন ছেলেমানুষীর দাম কোনদিন কমে না মানুষের। এখানে সে কেন আসিয়াছে? এই কড়া আলো, চড়া নির্ল্লজ্জতা, কুৎসিত গুণ্ডামির আবহাওয়ায়? কোমলতা বিসর্জ্জন দিতে? নিজের যে কোমলতার জন্য তরঙ্গের কথা ভাবিয়া এখনও তার মন কেমন করিতেছে?

বাকী সকলেও কি এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছে এখানে, এই নারী-পুরুষের দল? নিজের কোমলতা যে নিজেকে কষ্ট দেয়, এই রোগের চিকিৎসা করিতে?

মাঝবয়সী মাংসল মেয়েরাও যে এখানে আসিয়া রোগটার হাত হইতে রেহাই চান, একটু পরেই শঙ্কর তা চমৎকার বুঝিতে পারিল। বিদেশী পোষাক-পরা একটা হ্যাংলা পোকার সঙ্গে যে মহিলাটি সটান তাদের টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মুখের রঙ তাঁর খাঁটি রং। মিসেস সেন তিনি, নমিতা নাম।

লীলাময়ের যে তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেটা বোঝা গেল খাপছাড়া অভ্যর্থনার জবাবে লীলাময়ের ঘাড়ে তাঁর ছোট একটি চড় মারায়।

আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি বসিলেন। উঠিলেন একঘণ্টা পরে। বলিলেন, আপনার গাড়ীটা বাইরে দেখছিলাম কেদার বাবু, এসব তো অনেক খেলাম, একটু হাওয়া খাওয়াবেন ?

কেদারনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মিসেস সেন গাড়ীতে উঠিলেন আগে, উঠিয়াই বলিলেন, আসুন শঙ্করবাবু আপনি, আপনার সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ হল, আপনি আমার পাশে বসবেন। ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাওয়া যাক্, কেমন ?

সহরে চাঁদের আলো নাই, সহরের বাহিরে চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। পথের ধারে লাইট রেলওয়ের লাইন পাতা, দুদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে বাড়ী-ঘর ও গাছপালায় জমাটবাঁধা আবছা আবছা গ্রাম। কোমলতা-ব্যারামের চিকিৎসাটা জীবনে আজ প্রথম হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় শঙ্করের স্রেফ কান্না আসিতে লাগিল। এমন অদ্ভুত রকমের কোমল মনে হইতে লাগিল নিজেকে যে, বাঁদিকে লীলাময়ের পকেটের সিগারেটের কেস্‌টার চেয়ে ডাইনে মিসেস সেনের কোমল শরীরটা বেশী বিঁধিতে লাগিল তার দেহে। ডাইনীর নখের মত।

মিসেস সেন বলিলেন, একবার এদিকে এসে তালের রস

খেয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে কেদারবাবু? আহা কি স্বাদ টাটকা তালের রসের!—আজও জিভে জড়িয়ে আছে। কেবল গন্ধটা ভারি বিশ্রী।

মিসেস সেনের জড়ান জিভে তালের রসের স্বাদ জড়াইয়া থাকা আশ্চর্য্য নয়, শঙ্করের হৃদয় কিন্তু একবার স্পন্দিত হইতে ভুলিয়া গেল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, গ্রামটা চিনতে পারবেন? কাছাকাছি এসে পড়েছি নিশ্চয়। চলুন না একটু চেখে আসি? রাত্তির বেলা তালের রস—কি মজাই হবে!

বস্তুতান্ত্রিকতার এই রোমান্সের পরিচয় শঙ্কর ভাসা-ভাসা ভাবে রাখিত—লোকের মুখে শুনিয়াছে, মনস্তত্ত্ববিদের মুখে। রোজ যে পাঁচসিকা দামের সাবান মাখে, ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া নাকি তার কাছে রোমান্সের চরম। অপরাহ্ণ হইতেই নিজের মনের মধ্যে বসিয়া নিজেকে শঙ্কর ঘৃণা করিতেছিল, এখন রীতিমত চাবুক মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবু, সেই যন্ত্রণা-তেই যেন সে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব অনুভব করিতে লাগিল, বোধ করিতে লাগিল নিজেকে নিজে পীড়ন করার মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার তাগিদ। মেরুদণ্ড টান করিয়া এতক্ষণ সে সোজা হইয়া বসিয়াছিল, একবার মিসেস সেনের দিকে একটু হেলিয়া ঠেসান দিয়া বসিল। তাতে খুসী হইয়া মিসেস সেন হোটেলে লীলাময়ের ঘাড়ে যেমন একটা চড় মারিয়াছিলেন, শঙ্করকেও তেমনি একটা চড় মারিয়া আদর

করিলেন। লীলাময়ের সিগারেটের আগুনে তার আংটির পাথরটা বিপদ-জ্ঞাপক লাল আলোর মতই চমকাইয়া উঠিল।

মাইল দেড়েক গিয়া পাওয়া গেল একটা গ্রাম। তখনও গ্রামের আলো নেভে নাই, পথের ধারে ছোট ছোট দোকানগুলি বন্ধ হয় নাই। তাড়ির দোকানটা গ্রাম পার হইয়া একটু তফাতে। দেখা গেল, দোকানের খানিক দূরে ছোটখাট একটি ভিড় জমিয়াছে, দোকানের সামনে পুলিশ।

লীলাময় সভয়ে বলিলেন, পিকেটিং হচ্ছে।

পিকেটিং?—মিসেস সেনের শিহরণ অনুভব করিয়া শঙ্করের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, কাজ নেই তালের রসে বাবা, মানে মানে এখন ফিরে যাওয়া যাক।

গাড়ী ফিরাইতে ফিরাইতে দেখা গেল, ষোল-সতর বছর বয়সের একটি ছেলে পিকেটিং করিতে গিয়া পুলিশের হাতে পড়িল।

ব্যাক করিবার সময় গাড়ীর পিছনের চাকা নর্দ্দমার কাদায় ডুবিয়া গেল। কেদার ড্রাইভারকে এমন একটা গাল দিলেন যে অদূরে তাড়ির আড্ডায় যারা রোজ তাড়ির সঙ্গে গালাগালির রসও উপভোগ করে, শুনিলে তারা নিশ্চয় সমস্বরে বলিত, সাবাস! এখানে কেউ কিছু বলিল না, মিসেস সেন শুধু খিল খিল করিয়া একটু হাসিলেন। নর্দ্দমা ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টায় গাড়ীর ইঞ্জিন পরক্ষণে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, শঙ্করের মনে হইল মিসেস সেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া গাড়ীটাও যেন হাসিতেছে।

মাথার মধ্যে সব ওলট-পালট হইয়া যাইতেছিল শঙ্করের। সবই সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু যেন সব আবছা, এলোমেলো— কোথায় ছিল সে, কি করিয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সব তার মনে আছে, তবু যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কিছুই স্মরণ হইতেছে না। কয়েক ঘণ্টা আগের অতীত একান্ত অবাধ্য হইয়া ভবিষ্যতের কল্পনার মত স্মৃতির আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর ভিতরে একটা কষ্ট হইতেছে অকথ্য। একসঙ্গে আগুনে পোড়া আর শীতে জমিয়া যাওয়ার মত অদ্ভুত যন্ত্রণা।

গাড়ী নর্দ্দমা হইতে উঠিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রাম পার হইয়া যাওয়ার পর শঙ্কর বলিল, আমার গা কেমন করছে।

মিসেস সেন সভয়ে বলিলেন, সেরেছে! সরুন, সরুন, ওদিকে সরুন, ওদিক দিয়ে মুখ বার করুন।

গাড়ী বাঁধিতে বলিয়া ব্যাকুলভাবে শঙ্করকে তিনি দু'হাতে দূরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গাড়ী থামামাত্র দরজা খুলিয়া টুক করিয়া নামিয়া গেলেন। শঙ্করকে বলিলেন, আপনি নেমে আসুন তো।

শঙ্কর পথে নামিয়া দাঁড়াইলে মিসেস সেন বলিলেন, পথের ধারে বসে বমি করে নিন। একটু সরে যান, বমিকে আমি বড্ড ঘেন্না করি। আপনারা নামুন না একজন কেউ, একটু হেলপ্ করুন না ওঁকে? আচ্ছা, তুমিও তো নামতে পার? নাম, আমি সামনের সিটে বসব।

মিসেস সেনের সেই সঙ্গী চুপচাপ সম্মুখের আসনে বসিয়া ছিলেন, চুপচাপ নামিয়া আসিলেন। মিসেস সেন সেখানে উঠিয়া বসিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিও উঠে বসুন আমি হেলপ্ চাই না।

মিসেস সেন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, বমি করবেন বললেন যে?

কখন বললাম?

তবে গাড়ীতে উঠুন, তাড়াতাড়ি এখন টাউনে ফিরতে পারলে বাঁচি।

আপনারা যান আমি গ্রামে ফিরে যাব।

বলিয়া শঙ্কর গ্রামের দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

লীলাময় হাঁকিয়া বলিলেন, পাগলামি কোরো না শঙ্কর, গ্রামে গিয়ে কি করবে?

পিকেটিং করব।

আরও কয়েকটা আহ্বান আসিল, শঙ্কর কানে তুলিল না, একটু টলিতে টলিতে সোজা আগাইয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া গাড়ী ছাড়িবার শব্দ কানে আসিতে সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর আবার গ্রামের দিকে আগাইয়া চলিল। এবার চলিল আস্তে। গ্রাম বেশী দূরে নয়। এই নাম-না-জানা গ্রামের তাড়িখানায় পিকেটিং করিয়া পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগে যতটুকু সময় পারা যায় পরীক্ষা-শেষের জন্য তুলিয়া রাখা

এই জ্যোৎস্নাকে একটু উপভোগ করা যাক। আজই তো তার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।

কিন্তু পিকেটিং শঙ্কর কেন করিবে? কে মাথার দিব্য দিয়াছে? শঙ্কর তা জানে না। তার কেবল মনে হইতেছিল, আজ সারাদিন সে অনেক সুখ উপভোগ করিয়াছে, এবার কিছু দুঃখ তাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

সাধনার যে বিজন-ঠাকুরপো তরঙ্গের বাবা, তিনি ছিলেন প্রফেসর। বছর দুই তরঙ্গ যে স্বামীর ঘর করিয়াছে, তিনিও ছিলেন প্রফেসর—তরঙ্গের বাবার চেয়ে বড় ডিগ্রীধারী আর বেশী নাম-করা। দু'জন প্রফেসরের কাছে কত কিছুই যে তরঙ্গ শিখিয়াছে। তবে বাঙ্গালীর মেয়ে-বৌ যা-কিছু শেখে শুধু কল্পনা করার জন্যই শেখে—এবং কল্পনা করিতে করিতে কারও কারও কল্পনা আকাশ-পাতাল ছাড়াইয়া ও ছড়াইয়া যায়। যন্ত্রের মত এটা করিয়া গেলে কেউ বিশেষ কিছু মনে করে না, বড় জোর আনমনা উড়ু-উড়ু স্বভাবের জন্য একটু নিন্দা রটে। লোকে বলাবলি করে যে, এর বড় আনমনা উড়ু-উড়ু স্বভাব, এ যদি সর্ব্বনাশ না করে ছাড়ে তো আমার কান কেটে নিও! কিন্তু এমন উদ্‌ভ্রান্ত যদি কারও কল্পনা হয় যে, লোকের বলা-বলির ভয় না করিয়া কল্পনাটা পরিণত করিতে যায় কাজে, তখন বাধে সাংঘাতিক গোলমাল। এমন গোলমাল বাধে যে, তরঙ্গের স্বামীর মত পুরাপুরি আধুনিক স্বর্গীয় স্বামীর আধা-আধুনিক আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে সে টিঁকিতে পারে না।

তার উপর যখন বাপের বাড়ী বলিয়া কিছু না থাকে, আর অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ী বাস করা যে সম্ভব হইবে না তাও

ভাল করিয়া জানা থাকে, তখন তরঙ্গের মত মেয়ে সাধনার মত কারও বাড়ীতে আসিয়া বাস করে,—যার সঙ্গে সম্পর্কটা আসলও নয়, নকলও নয়, তবু অতীব ঘনিষ্ঠ।

তবে আশ্রিতা হিসাবে নয়, খরচ দিয়া। প্রফেসর বাবা, প্রফেসর স্বামী তরঙ্গের জন্য কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য দেবর-ভাসুরের প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া তরঙ্গ তার কাছে আসিয়া থাকিতে চায় শুনিয়া সাধনা যেমন আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, মাসে মাসে নিজের খরচ বাবদ সে টাকা দিবে শুনিয়া হইয়াছিলেন তেমনি আহত।

কেন? একবেলা দু'টি খাবে, তাও আমি তোমায় দিতে পারব না তরু?

তরঙ্গ একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, একবেলা তো খাব না খুড়িমা। চারবেলা খাব। খাওয়া-দাওয়া চলাফেরার সব নিয়ম-কানুন আমি ঠিক করে ফেলেছি। আমার নিজের নিয়ম মেনে চলতে চাইলাম বলেই তো ওখানে সবাই ক্ষেপে গেল। তবে আমি যাই করি খুড়িমা, তোমার কোন অসুবিধা হবে না, তোমার অত কুসংস্কার নেই জানি বলেই তো তোমার কাছে এলাম।

সাধনা বলিয়াছেন, সংসারে যা-খুসী তাই করলে কি চলে তরু?

সে রকম যা-খুসী তাই করা তো নয়,—অসংযমের কথা ভাবছ তো? আমার সংযম দেখে তুমি ভয় পেয়ে যাবে খুড়িমা।

যা দরকার নেই তা করব না, যা দরকার নেই তা খাব না, যা দরকার নেই তা ভাবব না --

অনেকক্ষণ ধরিয়া তরঙ্গ সাধনাকে বুঝাইতেছিল,—তার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাধনার কথা। স্তরে স্তরে জীবনকে সে ভোগ করিয়া ফেলিবে, এখন তো উনিশ বছর বয়স তার, চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ঘরের কোণে সে দেহমনকে বশ করিবার শক্তি অর্জ্জনের জন্য তপস্যা করিবে, ত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী শুধু অন্তঃপুরে ঘুরিয়া মেয়েদের বাঁচিয়া থাকিতে শিখাইবে, আর সেই সঙ্গে নিজেও শিখিয়া লইবে কি করিয়া অজানা-অচেনা মেয়েদের নানা কথা শিখাইতে হয়, তারপর আরম্ভ করিবে আসল কাজ—প্রবল প্রকাশ্য আন্দোলন, দেশকে যা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, ঘরে ঘরে হৈচৈ বাধাইয়া দিবে।—একটু বয়েস না হলে তো কেউ আমার কথা শুনবে না খুড়ি-মা।

শুনিতে শুনিতে সাধনার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, আহা, এই বয়সে শোকে তাপে মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে মেয়েটার। ওকে তো একটু স্নেহ-মমতা করা দরকার!

সেদিন তিনি তর্ক করেন নাই, প্রতিবাদও করেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা সে তো পরের কথা—যে ভাবে ভাল লাগে, তুমি সেই ভাবে এখানে থেকো তরু, কিন্তু টাকা-পয়সার কথাটা তুলো না, তুমি আমার মেয়ের মত, খাইখরচ বাবদ তুমি আমায় টাকা দেবে, আমার তা সইবে না বাছা।'

তরঙ্গ বলিয়াছিল, কেন সইবে না খুড়ি-মা? আমার যদি না থাকত, তা হলে অন্য কথা ছিল। তা ছাড়া, তুমি যদি খরচ না নেও, আমি এখানে থাকব না।

সাধনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এও তরঙ্গের মাথা খারাপ হওয়ার একটা লক্ষণ। আর কিছু তিনি বলেন নাই।

কিন্তু স্নেহ-মমতা করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, তরঙ্গ ওসব চায়ও না, তরঙ্গের ওসব প্রয়োজনও নাই। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের যে প্রণালী সে ঠিক করিয়াছে, তার মধ্যে হৃদয়টা গিয়াছে একবারে বাদ। সুখ, সুবিধা, আলস্য, আনন্দ, উপভোগ, এ সমস্তের জন্য এতটুকু ফাঁক সে প্রতিদিনকার জীবনে রাখে নাই। ঠিকা-ঝিকে তরঙ্গ দু'দিনের মধ্যে বিদায় দিল, নর্দ্দমা আর বাড়ীর নর্দ্দমার চেয়ে নোংরা অংশ ছাপ করিবার জন্য যে মেথর আসিত, তারও আসা বারণ হইয়া গেল।

না খুড়ি-মা বাধা দিও না। এসব আমার দরকার।

বাসন মাজা, জল তোলা, মসলা বাটা, রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, বিছানা তোলা, জামা সেলাই করা, যত কিছু কাজ আছে বাড়ীতে, মনে হইল সব যেন তরঙ্গ একা অধিকার করিতে চায়।

না খুড়ি-মা, বাধা দিও না এসব আমার দরকার।

এত কাজ করে কেউ বাঁচে তরু? রাত জেগে তুমি আবার বই পড়।

অতিরিক্ত কিছু তো করব না খুড়ি-মা। কতটা কাজ আমার

সইবে তা তো জানি না, কি নিয়মে কখন কি করলে ভাল হয় তা তো জানি না,—তাই পরীক্ষা করার মত এ ভাবে আরম্ভ করেছি। আস্তে আস্তে কমিয়ে বাড়িয়ে সময় বদঁলে খাপ খাইয়ে নেব খুড়ি-মা, কিছু ভেব না। রাত জেগে পড়া চলবে না, সেটা বুঝতে পেরেছি। আজ থেকে দুপুরে সেলাই না করে পড়ব।

ধীরে ধীরে তাই করিয়াছে তরঙ্গ, খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। কয়েকটা কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, অসহিষ্ণু ব্যস্ততার সঙ্গে অতি-রিক্ত কম সময়ে যে সব প্রয়োজনীয় কাজ করিত, সে সব কাজে সময় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সকালের কোন কাজ লইয়া গিয়াছে বিকালে, বিকালের কোন কাজ লইয়া আসিয়াছে সকালে।

মাসতিনেক পরে বাড়ীতে মেথরকে আসিবার অনুমতিও দিয়াছে।

এমন-যে তরঙ্গ তার জন্য একদিনে শঙ্কর কম কাণ্ড করে নাই। গরমে ও গুমোটে ভাপসা একটা দিনে পরীক্ষার হলে বসিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া লিখিয়াছে, প্রশ্ন-পত্রের জবাব, হৃদয় বিনিময় করিতে গিয়া তরঙ্গের সঙ্গে করিয়াছে মাথা ঠোকাঠুকি, তিন হাজার লোকের সামনে পরিচয় দিয়াছে মাথা খারাপ হওয়ায় হোটেলে গিয়া জীবনে প্রথম টানিয়াছে পেগ, তারপর সহরের অনেক দূরে তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিয়া গিয়াছে জেলে।

অথচ অনুপমের মারফতে খবরটা শুনিয়া তরঙ্গ শুধু বলিল, মোটে একুশ দিন !

সাধনা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, জহরের আরও বেশী দিন জেল হলে তুমি বুঝি খুসী হতে তরু ?

তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, তা হতাম। এ তো জেল নয় খুড়ি-মা, ওষুধ। একুশ দিন জেলে থেকে ভাবপ্রবণতা যদি একটু কমে তো শঙ্করদা বাঁচবে।

কি যে বল তুমি ঠিক নেই।

ঠিক কথাই বলি। শুনতে ভাল লাগে না।

সাধনা গম্ভীর মুখে বলিলেন, নাই বা বললে ঠিক কথা ? যা শুনতে ভাল লাগে না মিছি মিছি তা বলবার দরকার ? মিষ্টি কথা বলা আর দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলা হল মেয়েমানুষের কাজ, এমন কথা যদি খালি খালি তুমি বল যা শুনলে মানুষের রাগ হয়, তোমায় তো কেউ দু'চোখে দেখতে পারবে না বাছা !

কিন্তু কেউ যদি ঠিক কথা না বলে, সব যে তাহলে বেঠিক হয়ে যাবে ?

তুমি ঠিক কথা বললেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে ভাব ?

খানিকটা তো হবে।

সাধনা রাগ করিতে ভালবাসেন না। প্রুফ-রীডারের মত তিনি শুধু সংশোধন করিয়া যান,—মানুষকে আর সংসারকে। বানান-না-জানা প্রুফ-রীডারের মত হয়ত ভুলের সংশোধনেও তাঁর ভুল হয়, যা ভুল হয় তার সংশোধনও ভুল হয়, কিন্তু

সেজন্য তিনি সংশোধন করিতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না। কারণ, তিনি নিজে তো জানেন, তিনি যা সংশোধন করিয়াছেন তাই ঠিক। কিন্তু বাংলা প্রুফ-রীডারের সংস্কৃত প্রুফ দেখার মত, তরঙ্গের বেলায় তিনি পড়েন বিপদে। তরঙ্গকে শোধরাইতে গেলেই তাঁর মনে হয়, নিমি আর অনুপমের বেলা যে জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগান, এর বেলা সে সব কাজে লাগিবে না। সংসারে কি নিয়মে চলা উচিত সে উপদেশ তিনি যেন দিতে বসিয়াছেন সন্ন্যাসিনীকে।

তরঙ্গ তর্ক তুলিলেই সাধনার উপদেশ তাই পরিণত হয় মিনতি ও আপশোষে। মাথা নাড়িয়া তিনি বলেন, না তরু, তোমার কথাবার্ত্তা চালচলন দেখে আমার বড় ভাবনা হয়। কারো-না-কারো আশ্রয়ে মেয়েমানুষকে থাকতেই হবে, সবাই যদি তোমার কথা শুনে বিরক্ত হয়—

তরঙ্গ আর তর্ক করে না, করে কাজ। সাধনা কাজের খুঁত ধরিলে নীরবে সায় দিয়া খুঁত সংশোধন করে। কিন্তু গভীর একটা জ্বালা বোধ করে তরঙ্গ, একটা অচিন্তিত আত্মগ্লানি জাগে। এখন তার তপস্যার সময়, বিরাট এক ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে তৈরি করিতেছে তবু, সাধনার মত মানুষকে এই সব তুচ্ছ ছোট ছোট কথাগুলিও যদি সে এখন বুঝাইতে না পারে, তপস্যা সাঙ্গ করিয়া সাধনার চেয়েও অপদার্থ হাজার হাজার মানুষকে আরও বড়, আরও ব্যাপক কথাগুলি সে কি বুঝাইতে পারিবে? প্রতিদিন এত যে কষ্ট সে করিতেছে, শেষ

পর্য্যন্ত হয়ত তার কোন ফলই ফলিবে না। মানুষের মধ্যে নিজে সে কেবল হইয়া থাকিবে অদ্ভুত, বেমানান।

ভাতের হাঁড়িতে চাল দিয়া চিংড়ীমাছ সিদ্ধ রাঁধিবার জন্য সরিষা বাটিতে বসিয়া তরঙ্গ এই গ্লানি ও হতাশার ভাব দমন করিবার চেষ্টা করে, এ চেষ্টাও তার তপস্যার অঙ্গ। দুঃখ, বেদনা ও হতাশাকে সে মনে স্থান দিবে না বলিয়া নয়, সমস্ত বাহুল্য মনোভাবকে, সমস্ত বাহুল্য সহানুভূতিকে ইচ্ছামত দমন করিবার ক্ষমতা তার চাই। হাজার হাজার নরনারী একদিন তাহার কথা শুনিতে রাজী হইবে কি না, এ সমস্যার বিচার করিতে সে রাজী আছে, কারণ সেটা প্রয়োজনীয় চিন্তা, কিন্তু সমস্যার বিচারের সঙ্গে মনটা খারাপ করিয়া ফেলিতে সে রাজী নয়। কি লাভ আছে মন খারাপ করিয়া? তার জীবনে তার জীবনের পরিকল্পিত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে, মন খারাপ করা কোন্ কাজে লাগিবে? কি যুক্তিই বা আছে মন খারাপ করিবার? এই অনাবশ্যক বাহুল্য মানসিক অবস্থাটাকে কেন সে প্রশ্রয় দিবে?

সরিষা বাটা শেষ হইয়া যায়, তবু তরঙ্গের মন কিন্তু ভাল হয় না। সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়, ভাবে যে, প্রায় দু'বছর চেষ্টা করিয়া নিজের মনকে সে এটুকু বশও করিতে পারে নাই কি? ভাবিয়া আরও বেশী খারাপ হইয়া যায় মন। তখন তরঙ্গ বুঝিতে পারে, মনের একটা চাপা-পড়া জটিল আবর্ত্ত আজ মুক্তি পাইয়াছে। মন খারাপ হওয়া দমন করিবার চেষ্টার মধ্যে

আজ পর্য্যন্ত আজ তার মন খারাপ হওয়ার কারণের কারখানা বসিয়াছে। আজ তার মহা পরীক্ষার দিন।

গরমের দিন। রান্নাঘরে আরও বেশী গরম। তরঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। গরমের দিনে উনানের গরমে ঘামে ভিজিবার একটা কষ্ট আছে, এতদিন এ কষ্ট সহ্য করিতে তরঙ্গ গর্ব্ব বোধ করিয়াছে, আজ তার মনে হইতে লাগিল, এসব অকারণ, যাচিয়া এ কষ্ট সহ্য নিছক বোকামি। এরকম কথা মনে হওয়ার জন্য রাগে তরঙ্গের গা জ্বালা করিতে লাগিল। গা জ্বালা করিবার জন্য নিজের উপর তার অভিমানের সীমা রহিল না। আর অভিমানের সীমা না থাকায়—

একটা বেতের মোড়া আনিয়া অনুপম রান্নাঘরে বসিল।

'ঘামলে তোমায় যেন কি রকম দেখায় তরঙ্গ।'

'কি রকম দেখায় ?'

'রোদের মধ্যে বৃষ্টি হলে যেমন দেখায় তেমনি।'

তরঙ্গ ভাত টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না। হাত ধুইয়া একদিকের দেয়ালে বসান লম্বা কাঠের তাক হইতে এক প্লেট কাসুন্দী-মাখা জাম পারিয়া অনুপমকে দিল। তারপর ঢাকনি-লাগান এলুমিনিয়মের পাত্রে চিংড়ীমাছে নুন-মসলা মাখিতে মাখিতে বলিল, 'আর কেউ এ রকম কবিত্ব করলে আমার গা জ্বলে যায়, কিন্তু তোমার মুখে শুনলে খারাপ লাগে না। কবিত্ব করাটা বোধ হয় তোমার পক্ষে স্বাভাবিক অনুদা।'

অনুপম জ্যাগের বাঁচি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "কবিত্ব করলাম বুঝি? কথাটা মনে হল, তাই বললাম।'

'এরকম কথা মনে হওয়া আর বলাকেই কবিত্ব করা বলে। সরল ভাবে কবিত্ব কর বলেই বোধ হয় তোমাকে সইতে পারি। তা ছাড়া, তোমার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। দুবছর ধরে বলে বলে তোমার সিগারেটটা পর্য্যন্ত ছাড়াতে পারলাম না!'

অনুপম হাসিয়া বলিল, 'তুমি বল বলেই একেবারে ছাড়ি নি। তোমার হুকুম শুনব কেন?'

তরঙ্গ মুখ তুলিয়া বলিল, 'হুকুম আবার কিসের? খুড়িমাকে এত হিসেব করে সংসার চালাতে হয়, তোমার একটা পয়সা নষ্ট করা উচিত নয়।'

'মার পয়সা তো নষ্ট করি না, আমার টুইসনির টাকায় খাই।

'তাই বা খাবে কেন? সিগারেটে যে টাকা উড়িয়ে দাও, খুড়িমাকে সে টাকাটা দিতে পার না।'

অনুপম একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলে, 'সেইজন্যেই তো কমিয়ে দিয়েছি, একটা দুটোর বেশী খাই না।'

তরঙ্গ মুখ নামাইয়া বলে, 'একটা দুটো নয়। কাল বেলা দশটার সময় এক প্যাকেট কিনে এনেছিলে, রাত্রে ঘুমোন পর্য্যন্ত ছ'টা খেয়েছ।'

এ কথায় লজ্জা পাওয়ার বদলে অনুপম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'তুমি গুণে দেখেছ না কি?'

'গুণব না ? আলো জ্বেলে ঘুমোও কেন ?'

'আমি আলো জ্বেলে ঘুমোই বলে কটা সিগারেট খেয়েছি গুণে দেখেছ, ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না।'

তরঙ্গ এবার হাসিল।

'কাল আলো নেভাতে গিয়ে তোমার পকেট থেকে প্যাকেট বার করে গুণে দেখেছি।'

অনুপম গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তুমি তা হলে চুপি চুপি আমার পকেট হাতড়াও ?'

'চুরি করার জন্য হাতড়াই না কিন্তু।'

অনুপম গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ তরঙ্গের ঘামে-ভেজা মুখখানা নিরীক্ষণ করে,—আবিষ্কারকের দৃষ্টিতে। তারপর মৃদুস্বরে বলে, 'মাঝে মাঝে আমার পকেটে খুচরো পয়সা বেড়ে যায় তা জান ?'

'জানি বৈ কি। আমি বাড়িয়ে দিই, আমি জানব না তো কে জানবে ?'

'কেন বাড়াও ?'

'খুড়িমার জন্যে। পকেটে পয়সা না থাকলেই তো খুড়িমার কাছে হাত পাতবে।'

রান্নাঘরের গরমে নয়, অপমানে মুখ লাল করিয়া অনুপম বসিয়া থাকে।

তরঙ্গ নীরবে নির্ব্বিকার চিত্তে চিংড়ীমাছ সিদ্ধ করার পাত্রটির ঢাকনি ভাল করিয়া বন্ধ করে, তাকের উপর হইতে

সরু খানিকটা তার লইয়া পাত্রটি জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধে। তখনও অনুপমের মুখে লালাভ মেঘ সঞ্চারিত হইয়া আছে দেখিয়া বলে, 'এতে রাগ করার কি আছে? সহজ-সরল ব্যাপারকে ঘোরাল ক'র না অমুদা। আমি প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব রেখেছি, যখন রোজগার করবে শোধ দিয়ে দিও—না হয় সুদও দিও কিছু, তিন কি চার পারসেণ্ট। আমি তোমায় দান করি নি, ধার দিয়েছি।'

অনুপম রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা ব'ল না, খপর্দ্দার!'

রাত্রে অনুপম আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। আলো নিভাইতে গিয়া তরঙ্গ আলো নেভানর বদলে বিছানার কাছে গিয়া অনুপমের ঘুমন্ত মুখখানা একটু দেখিয়া বলিল, 'ঘুম আসে নি, চোখের পাতা কাঁপছে।'

শ্লেষ নয়, তরঙ্গ শ্লেষ করিতে জানে না!

অনুপম চোখ মিলিয়া বলিল, 'কেন জ্বালাতন করছ? তোমার জ্বালায় একটু ঘুমোতেও পাব না?'

'আমারও ঘুম আসছে না। চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

'এত রাত্রে?'

'রাত্রি ছাড়া সহরের রাস্তায় ভিড় ঠেলে বেড়ান যায়? ওঠ, জামা পরে নাও।'

তরঙ্গের মুখে এমন শ্রান্ত গাম্ভীর্য্য অনুপম কোনদিন দেখে নাই। আর কথা বলিবার সাহস তার হইল না। উঠিয়া

জামাটা গায়ে দিয়া পাম্পসুতে পা ঢুকাইয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল।

সাধনার তন্দ্রা আসিয়াছিল। তরঙ্গ তাঁকে ডাকিয়া তুলিল।

'আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি খুড়িমা।'

'এত রাত্রে!'

'গরমে শরীরটা কেমন করছে।'

সাধনা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'বেড়াতে হয় ছাতে গিয়ে পায়চারি কর। এত রাত্রে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে না।'

তরঙ্গ উদ্ধত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, 'কেন?'

'কেন তাও তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে? এটুকু বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই?'

'একা তো যাচ্ছি না, অনুদা'র সঙ্গে যাচ্ছি।'

'অনু যাবে না।'

'তবে আমি একাই যাব। দরজাটা দিয়ে যাও তো অনুদা।'

সোজা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া তরঙ্গ বাহির হইয়া গেল। একটু দ্বিধা করিয়া সাধনা বলিলেন, 'সঙ্গে যা অনু। কাল ওকে স্পষ্ট বলে দেব আমার বাড়ীতে ওর আর থাকা চলবে না।'

'এ বাড়ীতে আত্মীয়েরা সংবাদ পাইয়াছে কেবল শঙ্করের শেষ কীর্ত্তিটির। কারও লাগিয়াছে চমক, কেউ হইয়াছে অবাক, কারও লাগিয়াছে মজা, কেউ করিয়াছে আপ-

শোষ। কারণটা অনুমান করিতে পারিয়াছে সকলেই। পরীক্ষা খারাপ হওয়ার প্রতিক্রিয়া। লজ্জা ঠিক নয়,—লজ্জার জন্য হইলে শেষদিনের পরীক্ষা দিয়া শঙ্কর এ কাজ করিত না, এখন তো আর কেউ জানে না সে কেমন পরীক্ষা দিয়াছে! আত্মীয়-স্বজনকে মুখ না দেখানর জন্য হইলে শঙ্কর জেলে যাইত পরীক্ষার ফল বাহির হইলে,—তার এখন অনেক দেরী। এ কাজের প্রেরণা শঙ্করকে দিয়াছে, দুঃখ, গ্লানি, যন্ত্রণা —"রিয়্যাক্‌সন"। কিন্তু শঙ্করের মত ছেলে এমন পাগলামি করিল কেন? এত যে ফিটফাট থাকা তার স্বভাব, অসংখ্য ছোটবড় আরাম ছাড়া যে তার দিন চলে না—জেলে সে এ সব পাইবে কোথায়? আহা বড় কষ্ট হইবে ছেলেটার।

শঙ্করের মা একটু কাঁদিলেন, বীরেশ্বরকে বলিলেন, 'চুরি-ডাকাতির জন্যে তো নয়, জেলে ওকে চা খেতে দেবে তো বাবা?'

সীতা পিসামা বলিলেন, 'উঃ! কি আশ্চর্য্য মন মানুষের! পড়তে পড়তে আমায় বলত, এগজামিন শেষ হলে রোজ তিন-বার করে সিনেমায় যাবে, আর যেই না এগজামিন শেষ হওয়া, পিকেটিং করে বাবু গেলেন জেলে! বুঝতে পারছ বৌ, মানুষের মন কি রকম আশ্চর্য্য জিনিষ? সাধ ছিল সিনেমা দেখার, সাধ মেটাল জেলে গিয়ে!'

দেখা গেল, শঙ্করের কীর্ত্তিতে সব চেয়ে বিচলিত হইয়াছেন রামলাল।

রামলালের দোষ নাই। সেদিন সন্ধ্যায় রামলালও সেই হোটেলে ছিলেন—প্রায়ই থাকেন।

ছেলেকে তিনি হোটেলে ঢুকিতে দেখিয়াছিলেন, "পেগ" টানিতেও দেখিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বাপের পক্ষে একটু বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

রামলালের অনুভূতি বড় ভোঁতা, মানুষটা তিনি তাই নির্ব্বিকার। এত বেশী নির্ব্বিকার যে মদে তাঁর না হয় নেশা, না জাগে বিকার। কেবল সাধারণ অবস্থায় কিছু ভাল-না-লাগা আর কিছু খারাপ-না-লাগার অস্বাভাবিক স্থায়ী সমন্বয়ের মধ্যে, কিছু ভাল-না-লাগাটা মদের শাসনে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে,—তিনি মনে করেন, তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট বৈচিত্র্য, পরম লাভ। জীবনে তাঁর কোন স্বাদ নাই, জীবনটা তাই সাধারণভাবে বিস্বাদ করিয়াই তিনি কৃতার্থ,—সকলের জীবন যতটুকু বিস্বাদ। এ বিষয়ে তিনি নিরুপায়। চামড়া যাঁর এত মোটা যে, জীবন-দেবতার গায়ে হাত-বুলান আদর টেরও পান না, প্রহার ছাড়া তাঁর চলিবে কেন ?

কিন্তু ছেলে মদ টানিতেছে, এ প্রহার নয়।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকিয়া সেদিন তিনি হোটেল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। যে উপায়ে নিয়মিত ভাবে জীবনটা তিনি যতটুকু বিস্বাদ করেন, কল্পনাতীত রূপে সেদিন তার চেয়ে বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল,—কড়া এবং ঝাঁঝাল। কতকাল পরে যে এ রকম কড়া ও ঝাঁঝাল কষ্ট পাইলেন, রামলালের মনেও

ছিল না। শঙ্কর তাঁকে দেখিতে পাইয়াছে কি না এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল, শঙ্করের জেলে যাওয়ার খবরে এ সন্দেহ মিটিয়া গেল। একটু খুসীও তিনি হইলেন, তাঁকে দেখিয়াছিল বলিয়া নিজের অপকীর্ত্তির লজ্জা এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল শঙ্করের যে, জেলে না গিয়া সে থাকিতে পারে নাই—এ যেন একটা সান্ত্বনা, এ যেন একটা প্রমাণ যে শঙ্কর বেশী বিগড়াইয়া যায় নাই, এ যেন শঙ্করের পরোক্ষ ঘোষণা যে, আর কখনও এমন কাজ সে করিবে না।

কিন্তু এ সান্ত্বনা, প্রমাণ বা পরোক্ষ ঘোষণা রামলালের কাজে লাগিল না, এতকালের ভোঁতা অনুভূতি হঠাৎ বিদ্রোহ করিয়া তাঁকে অনভ্যস্ত কষ্ট দিতে লাগিল। এ কাজ শঙ্কর করিয়াছে কেন, একটি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব রামলাল খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁর মত লোক যার বাপ, সে এই রকমই করে। জীব-জগতের নিয়মই এই। শঙ্করকে তিনি দোষ দিতে পারেন না, জন্ম তিনি শঙ্করকে যেমন দিয়াছেন, মদের গ্লাস হাতে করার কামনাও তেমনই তাঁরই দান।

রামলাল নিজেও যেমন বাড়ীর মানুষগুলি সম্বন্ধে নির্ব্বিকার, বাড়ীর মানুষগুলিও তাঁর সম্বন্ধে তেমনই উদাসীন। কিন্তু হঠাৎ রামলালের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বাড়ীর লোকে অবাক্ হইয়া গেল। সন্ধ্যার আগে রামলাল বাড়ী ফেরেন, এ-ঘরে ও-ঘরে ছটফট করিয়া বেড়ান, যাচিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলেন, নিজের সুখ-সুবিধার দাবী জানান, কারণে অকারণে রাগেন

আর বকেন এবং পরক্ষণে অনুতপ্ত হইয়া, বড় মানুষকে বকিয়া থাকিলে আদর করেন বাড়ীর কয়েকটি শিশুর যে-কোন এক-টিকে, ছোট মানুষকে বকিয়া থাকিলে বড় মানুষের যে-কোন একজনের সঙ্গে মিষ্টি করিয়া কথা বলেন—অবান্তর খাপছাড়া সব কথা। রামলাল মদ খাইলেও টের পাওয়া কঠিন, তবু সকলেই এখন টের পায় মদ তিনি খান নাই—মদ তিনি খাইতেছেন না।

কদিনের জন্যই বা শঙ্কর জেলে গিয়াছে, তাতেই এত? রামলালের এমন পুত্রস্নেহের খবর তো ইহারা রাখিত না!

সীতা বলেন, 'কেন এত ভাবছ দাদা? দু'চার বছরের জেল তো হয় নি!'

'জেলের জন্য নয়! ওর আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি বল্ তো?'

'সর্ব্বনাশ! কিসের সর্ব্বনাশ?'

'সে তুই বুঝবি না। মানুষের মধ্যে বংশগত প্রভাব কত জোরাল হতে পারে, তুই তার কি জানিস্?'

সীতা আহতা হইয়া বলেন, 'আমি জানি না? মানুষের মন সম্বন্ধে এত বই পড়ি, এত ভাবি, আমি বংশগত প্রভাবের কথা জানি না! আমাকে মুখ্যু ভাব বুঝি তুমি?'

সীতার ভাবোচ্ছ্বাস ঠেকাইবার জন্য রামলাল তাড়াতাড়ি বলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তুই জানিস, সব জানিস।'

সীতা বলেন, 'মানুষের মন কি আশ্চর্য্য দেখলে তো? এই

বললে জানিস না, আবার বলছ জানিস! মানুষের মনের কথা যখন ভাবতে আরম্ভ করি দাদা—'

রামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'মনে মনে ভাবতে পারিস না? তোর মনের কথা শুনতে শুনতে মানুষের গায়ে জ্বর আসে।'

শঙ্করকে 'পেগ' টানিতে দেখিয়া রামলালের যেমন হইয়াছিল, এ কথায় সীতাও তেমনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া কপালের স্থায়ী রেখাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি রেখা দেখা দিল—এক মুহূর্ত্তে সীতার যেন বার্দ্ধক্য আসিয়াছে। চলন্ত গাড়ীর বাঁক ঘুরিবার মত অর্দ্ধচক্রাকারে একটা পাক দিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, গেলেন বীরেশ্বরের কাছে। কপালের স্থায়ী রেখাটিকে বাঁ হাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়া সজোরে ঘষিতে ঘষিতে নালিশ করিলেন। 'এখানে আমার তো আর থাকা হয় না বাবা!'

বীরেশ্বর শান্ত ভাবে বলিলেন, 'কেন?'

'কি করে থাকি? তুমি বুড়ো হয়েছ, আজ বাদে কাল চোখ বুজবে। দাদা তখন আমায় দূর দূর করে খেদিয়ে দেবে না?'

'এখনো তো চোখ বুজি নি। আগে চোখ বুজি, তারপর সে কথা ভাবিস।'

'তখন ভেবে কি হবে? ভবিষ্যতের কথা আগে থেকে ভাবতে হয়। মানুষের মন কি রকম আশ্চর্য্য জিনিষ তুমি জান না বাবা, আমার নামে কটা টাকা লিখে দিয়েছ বলে

আমার কথা শুনতে দাদার এখন গায়ে জ্বর আসে। কটা টাকাই বা তুমি আমাকে দিয়েছ? তাও দাদার সইছে না। আমি এখানে থাকব না বাবা।'

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'আরও কিছু তোকে দিয়ে যাব সীতা, ভবিষ্যতের জন্য তোকে ভাবতে হবে না। এখানেই থাক্ তুই।'

সীতাকে এখানে থাকিতে বলা বাহুল্যমাত্র, কারণ থাকিতে না বলিলেও যে তিনি এখানে থাকিবেন না, এমন কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে থাকিতে বলাটাই বীরেশ্বরের স্বভাব।

পরদিন সকালে তরঙ্গ আসিয়া যখন বলিল, 'দাদু, আপনার এখানে আমায় থাকতে দেবেন?' তখনও কেন, কি বৃত্তান্ত—কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাকেও তিনি থাকিতেই বলিলেন।

কৈফিয়ৎ দাবী করিতে গেলেন সাধনার কাছে।

সাধনা বলিলেন, 'আমার কোন দোষ নেই বাবা। আমি শুধু বলেছি, এ রকম করলে আমার এখানে থাকতে পারবে না। মেয়ে অমনি হুট্ করে চলে গেলেন।'

'তাই বা কেন বললে?'

'বলব না? আমার বাড়ীতে থেকে আমার ছেলেমেয়ের মাথা খাবে, আমি চুপ করে বসে থাকব? এতকাল সয়ে এসেছি, কিন্তু মানুষের কতকাল সয়? রাত বারোটার সময় মেয়ে গট গট করে হাওয়া খেতে বেরোবেন রাস্তায়!'

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। সাধনা নতমুখে আঁচল জড়াইয়া হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, 'আমি চলে যেতে বলিনি বাবা, ভাবিও নি ঐ কথাতে রাগ করে চলে যাবে। বাড়ীটা আমার খালি হয়ে গেছে।'

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

জেল হইতে শঙ্করও বাড়ী ফিরিল গম্ভীর মুখেই।

তরঙ্গকে কেহ সহ্য করতে পারে না।

যে কেবল নিজের নিয়ম মানিয়া চলে, অথচ পিছনে লাগে সকলের, কে তাকে সহ্য করিতে পারিবে? না করিবে সে সহজভাবে একটা কাজ, না বলিবে সহজভাবে একটা কথা। অনবরত নিজের অস্বাভাবিক অসাধারণত্বকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু এমন উদাসীন, শান্ত, সংযমের সঙ্গে কাজটা সে করিবে যে, সকলের মনে হইবে, এটা হয় তার ছেলেখেলা, নয় লীলাখেলা। বাড়ীর আর পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে তরঙ্গের কথা বলাবলি করে। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না যে, পাঁচ মিনিট তরঙ্গের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে বড় শাস্তি আর নাই। অথচ এমন একটা আকর্ষণ আছে তরঙ্গের পীড়াদায়ক সঙ্গের যে, দুপুরবেলা তরঙ্গের ঘরে ভিড় জমিয়া যায় পাড়ার আর বাড়ীর মেয়েদের।

তরঙ্গ একাই যেন একটা যাত্রাভিনয় অথবা থিয়েটার।

আসলে এইটুকুই তরঙ্গের আকর্ষণ। সে যা বলে আর করে, তার এতটুকু দাম কারও কাছে নাই, কেন আর কিভাবে সে কোন্ কথাটা বলে আর কোন্ কাজটা করে, শুধু সেইটুকু লক্ষ্য করিবার জন্য সকলে গভীর কৌতূহল অনুভব করে। মেয়েদের মধ্যে বৃহত্তর মহত্তর কিছু—কিছুটা যে কি, এখনও তরঙ্গ অবশ্য নিজেই তা ভাল করিয়া বোঝে না—সঞ্চারিত করিতে চাহিয়া তরঙ্গ শুধু সঞ্চারিত করে কৌতূহল। সভয় দৃষ্টিতে সাপুড়ের সাপ নাচানো দেখিবার কৌতূহল এবং সে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যাত্রা-থিয়েটার দেখিতে যাওয়ার মত প্রচণ্ড উৎসাহ!

এই উৎসাহটা তরঙ্গকে মুগ্ধ করে। সে ভাবে, ইতিমধ্যেই কি তার জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হইতে আরম্ভ করিয়াছে? কি শুভক্ষণেই সে সাধনার বাড়ী ছাড়িয়া এ বাড়ীতে বাস করিতে আসিয়াছিল! কই, সেখানে তো পাড়ার মেয়েরা এমন ভাবে তার কাছে আসিয়া তার কথা শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল হয় নাই? এখানে যে একবার তার কাছে আসিয়াছে ঘন ঘন না আসিয়া সে পারে না। সে তবু কতটুকুই বা নিজেকে এখানে প্রকাশ করিয়াছে? মেয়েদের জীবনকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার জন্য কতটুকু চেষ্টাই বা সে করিয়াছে?

তরঙ্গ রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু নিজেই সে নিজেকে গর্ব্ব অনুভব করিতে বারণ করিয়া দিয়াছে, তাই গর্ব্বটাকে সে ধরিয়া লইয়াছে আনন্দ বলিয়া। যত বেশী

গর্ব্ব হয় তরঙ্গের, নিজেকে সে তত বেশী আনন্দিত মনে করে।

এ কথাটা তার মনেও থাকে না যে, আনন্দ অনুভব করাটাও তার নিজের নিয়মে নিষেধ।

কেবল তাই নয়, এ কথাটাও তরঙ্গ বুঝিতে পারে না যে, কেউ তাকে সহ্য করিতে পারে না। যাকে সহ্য হয় না, তার সঙ্গেও যে মানুষের যাচিয়া কথা বলিবার সাধ জাগা সম্ভব, এটা বুঝিবার মত বুদ্ধি হয়ত তরঙ্গের আছে, কিন্তু বুঝিবার ইচ্ছাও নাই, চেষ্টাও নাই। চারিদিকে অজস্র সঙ্কেত আছে যে, সে কারও প্রিয়া নয়, কিন্তু একটা সঙ্কেত সে গ্রহণও করে না, গ্রাহ্যও করে না। মনের জোর কি সাধারণ তরঙ্গের!

দেখা গেল, শঙ্করও যেন তরঙ্গকে আর পছন্দ করিতেছে না।

প্রেমে যেন ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে শঙ্করের, জোয়ার আসিয়াছে পড়িবার নেশার। আকাশে চাঁদ থাকে, বাড়ীর কোন একটা ঘরে তরঙ্গ থাকে, অথচ শঙ্করের ঘরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বলে আলো। কিছুই করে না শঙ্কর,—চিরকাল যা করিয়া আসিয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু। খায় দায় ঘুমায়, আর রাত জাগিয়া পড়ে।

দেখিয়া রামলাল স্বস্তি পান, নিশ্চিন্ত মনে আবার এখানে-ওখানে পিপাসা নিবারণ করিয়া গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিবার পুরাতন প্রথাটা ফিরাইয়া আনেন, কিন্তু শঙ্করকে আর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িতে বলেন না!

হয়ত ভাবেন যে, তাঁর হুকুমে সাধ মিটাইয়া রাত জাগিতে পারিত না বলিয়াই শঙ্কর কেবল হোটেলে গিয়া 'পেগ' টানিয়াছিল! জাগুক, হোটেলে যাওয়ার বদলে বাড়ীতে যত খুসী রাত জাগুক।

তরঙ্গ বলে, 'এখন আবার এত পড়া কেন?'

শঙ্কর বলে, 'পড়ার আবার এখন তখন আছে না কি?'

'পরীক্ষা তো নেই।'

'আমি পরীক্ষার জন্য পড়ি না।'

তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলে, 'সব সময় আত্ম-প্রবঞ্চনা নিয়ে থাকবেন, আপনাদের নিয়ে আমি কি যে করি!'

'আমাদের নিয়ে তোমার কিছু করতে হবে না।'—বলিয়া শঙ্কর এমনভাবে স্থান ত্যাগ করে যে, অন্য মেয়ে হইলে রীতিমত অপমান বোধ করিত। জটিল বোধশক্তি লইয়া তরঙ্গ যা বোধ করে, তার কোন সংজ্ঞা নাই।

তবে অনুপম আসিলে এবং চলিয়া গেলে তরঙ্গ যা অনুভব করে, তার মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে না। অনুপমকে দেখিলে তার আনন্দ হয়, অনুপম চলিয়া গেলে হয় কষ্ট। রাত্রে এখন আর অনুপমের ঘরে আলো নিভাইবার উপায় নাই, নিজের ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিবার সময় বোধ হয় সেইজন্যই তরঙ্গের মনে হয় অনুপমের আসিয়া চলিয়া যাওয়াটা কোন এক দিক দিয়া যেন ঘরে আলোটা জ্বালিয়া নিভাইয়া দিবার সামিল।

অনুপমের জন্য চোখে অন্ধকার দেখে বলিয়া অবশ্য একথা মনে হয় না তরঙ্গের,—সে ভাবে চোখে অন্ধকার দেখিবার একটা সুবিধা আছে, আসল ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনুপমের আসা-যাওয়ার সঙ্গে নিজের এ রকম স্পষ্ট আনন্দ ও নিরানন্দ বোধ করিবার সম্পর্কটা বুঝিবার জন্য তরঙ্গকে নিজের মনের অন্ধকার হাতড়াইতে হয়।

সেজন্য অনুপমের কথাটা তরঙ্গ অনেক সময় ভাবে। প্রায় সর্ব্বদাই।

অনুপমের কথা সব সময় ভাবিতে সাধ হয় বলিয়া ভাবে না। ছি, ওসব দুর্ব্বলতা তরঙ্গের নাই, সে কি আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত যে কিছুদিন একটা কলেজে পড়া সিগারেট-টানা আধা-কবি ছোকরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল বলিয়া, রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুমানর বদলে সেই ছোকরার স্বপ্ন দেখিবে? অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে বলিয়া, কেন অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে, শুধু এইটুকু বুঝিবার জন্য সে অনুপমের কথা ভাবে আর কোন কারণ নাই।

এ বাড়ীতে লোক অনেক। অনুপম আসিলে তার সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ বড় কম। সেজন্য তরঙ্গের রাগ হয়।

কেন রাগ হয় সেটা বুঝিবার জন্যও তরঙ্গ অনুপমের কথা ভাবে। নিজেকে না বুঝিলে তার চলিবে কেন? জীবনের স্তরে স্তরে নিজের সাধনালব্ধ অসীম শক্তিকে সঞ্চারিত করিয়া সৃষ্টি-বিপর্য্যয়ের অস্থায়ী কল্যাণকর বিপ্লব আনিয়া বৃহত্তর মহত্তর জীবনের

স্তর সৃষ্টি করা যার জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনে কাল-বৈশাখীর মত ভ্রান্ত ঝড়-ঝাপটা আসিলেও হৃদয়-মনকে নিস্তরঙ্গ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন যার দিবারাত্রির তপস্যা, একজনের সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপ করার সুযোগ না পাওয়ায় রাগ যদি তার হয়, সে রাগের কারণ খুঁজিয়া বাহির না করিলে তার চলিবে কেন? আর এ কারণটা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, যার সঙ্গে আলাপ করিতে না পারায় রাগের জন্ম, তার কথাটা না ভাবিলেও বা চলিবে কেন?

একটু উদাস মনে হয় তরঙ্গকে। একটু শিথিল মনে হয় তার জীবন-যাপনের কঠোর অনমনীয় নিয়মপালন।

একটু শ্রান্ত মনে হয় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন।

একটু উৎসুক মনে হয় তার দৃষ্টি।

এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তরঙ্গের অদ্ভুত খাপছাড়া চালচলনের উগ্রতাও কমিয়া আসে। তার ফলে তরঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু নমনীয়তা আর কোমলতার আবির্ভাব ঘটিলেও অন্যদিকে ফলটা হয় বড় খারাপ। মেয়েদের কাছে তরঙ্গের সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের অসাধারণত্ব বড় তাড়াতাড়ি কমিয়া আসে। তার আনমনা ভাবটা অবশ্য একেবারে আনকোড়া নতুন, কিন্তু আনমনা মেয়ের কি অভাব আছে জগতে? যার কথা শুনিলে মনে মনে রাগ হয়, ভিতরে একটা বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ভাব জাগে, সংসারের ছুটো সুখ-দুঃখের কথা বলা যার সঙ্গে অসম্ভব, তার

পীড়াদায়ক সঙ্গ উপভোগ করিতে মানুষকে টানিয়া আনার মত আকর্ষণ কারও আনমনা ভাবের থাকিতে পারে না।

পাড়ার ও বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে তরঙ্গের কথা বলাবলি করে কম। তরঙ্গের কাছে আসা-যাওয়াতে তাদের ভাঁটা পড়িয়া আসে। রাজরাণীর মত রূপ লইয়া চাকরাণীর মত খাটিয়া যাওয়া, ভিখারিণীর মত বিনয় লইয়া মাষ্টারনীর মত উপদেশ দেওয়া, মানিবার নিয়ম না মানিয়া যত সব উদ্ভট নিয়ম মানিয়া চলা,—তরঙ্গের মধ্যে এ সমস্তের সমন্বয়ের আকর্ষণ কমিয়া আসার সঙ্গে তার সম্বন্ধে সকলের বিরাগের ভাবটাই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে।

তরঙ্গের ঘরে দুপুরের সভাটি আর জমকালো হয় না। তরঙ্গ বিস্মিত আহত দৃষ্টিতে সভাটিকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতে দেখে, মেয়েরা অনেকে যে তাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা অনুভব করিয়া মনে তার জ্বালা ধরিয়া যায়।

কারও কাছে উপদেশ গ্রহণ না করিয়া, পথের সন্ধান না চাহিয়া নিজের অহঙ্কারী আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে এতদিন ধরিয়া সে যে নিজের মধ্যে সংযম জমা করিয়াছে, মনে হয় শুকনো খড়ের গাদার মত তাতেই বুঝি আগুন ধরিয়া গেল!

একদিন সাধনা আসিয়া বলেন, 'ফিরে যাবি তরু? চল্ না?'

'না।'

'আমি কিন্তু তোকে তাড়িয়ে দিইনি। দিয়েছি?'

'না।'

'তবে রাগ করে চলে এলি কেন? ফিরে চল্!'

'না!'

'না! না! না!—ছোট মেয়ে হলে মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দিতাম।'

রাগে দুঃখে অভিমানে অপমানে সাধনার চোখে জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। এ কি অদ্ভুত মেয়ে! বিনা বাক্যব্যয়ে এতদিনের আশ্রয় ছাড়িয়া পরের বাড়ী চলিয়া আসিল, এতটুকু অস্বস্তি বোধ না করিয়া পরের বাড়ী জাঁকিয়া বসিয়া দিন কাটাইতে আরম্ভ করিল। ভাব দেখিয়া মনে হয়, তার বাড়ীতে এতকাল সে যে বাস করিয়াছিল, কথাটা তার স্মরণ পর্য্যন্ত নাই।

তরঙ্গ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'অনুদা আসে না কেন খুড়িমা?'

'নানা কাজে ব্যস্ত থাকে, সময় পায় না।'

কথাটা শুনিয়াই তরঙ্গ রাগে আগুন হইয়া ওঠে। মনে হয়, আজ এই রকম একটা তুচ্ছ কথায় বোমার মত ফাটিয়া যাওয়ার জন্যই সে যেন এতকাল আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছে!

'কাজে ব্যস্ত থাকে, না? সময় পায় না, না? ব'লো খুড়িমা তাকে, আমিও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কোনদিন যদি

আমায় জ্বালাতে আসে, ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দেব—যদি না দিই তো—'

দুম্ দুম্ পা ফেলিয়া তরঙ্গ চলিয়া যায়। সাধনার হৃৎপিণ্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করে। তরঙ্গকে আজ স্পষ্ট চেনা গেল। কিন্তু অনুপম? তার ছেলে অনুপম?

সীতা বলেন, 'মেয়েটা পাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য মন মানুষের, পাগল মনে হলেও ওকে পাগল মনে হয় না।'

সাধনা মুখ কালি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান।

নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তরঙ্গ শুইয়া পড়ে বিছানায়। রাগের মাথায় দুম দুম পা ফেলিয়া নিজের ঘরে আসিতে তার যে বিশেষ কিছু পরিশ্রম হইয়াছে তা নয়, তবু হাঁপানোর মত সে জোরে জোরে নিশ্বাস টানে। উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিবার সঙ্গে ভিতরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে—এ বাড়ীতে চলিয়া আসিবার আগের দিন সাধনার বাড়ীতে সে যে আত্মগ্লানি অনুভব কারয়াছিল তার চেয়ে প্রবল এবং কড়া আত্মগ্লানি!

সেদিন রাত্রে খাইতে বসিলে সাধনা অনুপমকে বলিলেন, 'শঙ্করদের বাড়ীতে বেশী আসা-যাওয়া করিস না অনু।'

'কেন?'

সাধনা কৈফিয়ৎ না দিয়া শুধু বলিলেন, 'কি দরকার?'

অনুপম বলিল, 'শঙ্করদের বাড়ী যাবার দরকার কিছু নেই তা বুঝলাম, তবু যেতে যখন বারণ করছ, কারণ তো আছে?'

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, ‘বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ী বেশী না যাওয়াই তো ভাল।’

অনুপম খাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, ‘তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটেছে, আমার কাছে চেপে যাচ্ছ। খুলে বল তো, শুনি কি হয়েছে? আমার কাছে গোপন না করলেও চলবে।’

সাধনা বিব্রত হইয়া বলিলেন, ‘কি আবার হবে? কিছুই হয় নি।’

‘শাগগির বল মা, যতক্ষণ না বলবে হাত গুটিয়ে বসে থাকব, খাব না।’

সাধনা একটু ভাবিলেন, বলিলেন, ‘বিশেষ কিছু নয়, আজ গিয়েছিলাম তো শঙ্করদের বাড়ী—ওদের কথাবার্ত্তা শুনে ভাবভঙ্গী দেখে কেমন মনে হল, আমরা ও বাড়ীতে যাই, এটা ওরা পছন্দ করে না।’

‘তার মানে ওরা তোমায় অপমান করেছে?’

‘অপমান আবার কে করবে? ওদের চালচলন দেখে কথাটা আমার মনে হল, এইমাত্র।’

‘এমনি ও কথা মনে হবে কেন? নিশ্চয় তোমাকে অপমান করেছে মা, তুমি লুকোচ্ছো।’

বিব্রত সাধনা এবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ‘বাবারে বাবা, তোর সঙ্গে আর পারি না অনু, একটা কথা বললে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত। অপমান করেছে তো বেশ করেছে, তোর

কি? তুই আর ওদের বাড়ী যাস না, তাতেই হবে। বক বক না করে খা তো এখন।'

সুতরাং পরদিন সকালেই অনুপম শঙ্করের বাড়ী গেল। কারও সঙ্গে কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে সতুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তরঙ্গ কোথায় রে সতু?'

সংবাদ দিতে সতু তেমন পটু নয়। তবু অনুপম বুঝিতে পারিল যে, কাল বিকালে এক সময় তরঙ্গ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে নাই, হাজার ডাকাডাকিতেও না।

অনুপমকে বেশী ডাকিতে হইল না, তরঙ্গ দরজা খুলিয়া দিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে তরঙ্গের, দেখিলে মনে হয় সারারাত ঘরের মধ্যে কাটানর বদলে সে যেন এই মাত্র কড়া রোদে টো টো টহল দিয়া আসিল।

তবু একটু হাসিতে ছাড়িল না তরঙ্গ।

'কি খবর অনুদা!'

অনুপম বলিল, 'তোমার কাছেই খবর জানতে এসেছি। মাকে না কি কাল এবাড়ীতে অপমান করেছে?'

'অপমান করেছে? কে অপমান করেছে? আমি তো কিছু জানি না!—ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি অপমান করেছি।'

'তুমি?'

'অবাক্ হয়ে গেলে দেখছি, আমি কি কাউকে অপমান

করতে পারি না অনুদা ? কাল কি হল জান, আমি খুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলাম, অনুদা আসে না কেন খুড়িমা ? খুড়িমা বললেন, কাজের ভিড়ে সময় পায় না—শুনেই আমি রেগে গেলাম।'

'কেন ? ও কথায় রাগের কি আছে ?'

'সেই তো মজা, আমিও কাল সারারাত তাই ভেবেছি। ভেবে কি আবিষ্কার করেছি, সেটা আজ আর তোমার শুনে কাজ নেই, তারপর কি হল শোন। খুড়িমার কথা শুনে আমি রেগে বললাম, অনুদা যদি কোনদিন এ বাড়ীতে আসে ঝেঁটিয়ে অনুদাকে দূর করে দেব। তা হলেই বুঝ্‌তে পারছ, খুড়িমাকে আমি অপমান করিনি, অপমান করেছি তোমাকে। কিন্তু তুমি ছেলে কি না, অপমানটা তাই খুড়িমার বুকে বেজেছে।'

অনুপম হাসিয়া বলিল, 'এই ব্যাপার। কই আমাকে তো ঝেঁটিয়ে দূর করে দিলে না ?'

তরঙ্গও হাসিয়া বলিল, 'ঝেঁটিয়ে দূর না করি, এমনি তোমায় আজ দূর করে দেব। কয়েকমাস তুমি এ বাড়ীতে এস না।'

'কিছু বুঝতে পারছি না তরঙ্গ, সব হেঁয়ালি লাগছে।'

'আমি যখন মরব, তখন সব বুঝ্‌তে পারবে। তোমায় সব বুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব।'

'মরব মানে ?

'মরব মানে ? মরব মানে আত্মহত্যা করব। ঐ

কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে হোক্, বিষ খেয়ে হোক্, সটান স্বর্গে চলে যাব। মাস দুই তুমি কিন্তু তুমি এস না অনুদা। দেখি যদি না মরে চলে।'

মাস দুই। দু'মাস অনুপমকে না দেখিলেই মনের অসুখটা সারাইয়া ফেলিতে পারিবে, এরকম আশা পোষণ করা তরঙ্গের মত অহঙ্কারী মেয়ের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। এদিকে অনুপমও বোকা নয়। দু'মাসের মধ্যে কতবার সে যে তরঙ্গের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কিন্তু তরঙ্গ না দিল তাকে এতটুকু আমল, না বলিতে চাহিল তার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা। তারপর একদিন নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চড়া মেজাজে এমন কড়া ধমকই সে দিল অনুপমকে যে, তারপর মাস দুই আর সে এমুখো হইল না।

মাস দুই পরে যখন আসিল, তরঙ্গ তখন নিজের ঘরে কড়িকাঠে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছে, পুলিশ আসিবার প্রতীক্ষায় তাকে নামান পর্য্যন্ত হয় নাই। অনুপমের নামে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে কিন্তু সে ভোলে নাই। অনুপমের নাম লেখা খামখানা সীতার জিম্মায় ছিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে খামখানা অনুপমের হাতে দিল। মোটা ভারি খাম। হাতে করিলেই বুঝা যায়, তরঙ্গ অনুপমের নামে শুধু চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই, মস্ত চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুপম,

তোমার জন্য গলায় দড়ি দিয়েছি? তোমায় ভালবাসি বলে? কি গভীর আনন্দই না জানি তুমি উপভোগ করছ! কিন্তু এ জন্য বেশী অনুতাপ ক'র না, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হ'য়ো না। পার ত' গোপনে একটু কাঁদাকাটা ক'র আমার জন্য। চেষ্টা করতে দোষ কি? তবে গভীর শোকের মধ্যে. তোমার জন্য আমি মরছি ভেবে যদি গভীরতর আনন্দ উপভোগ কর, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে ব'স। আমার ত মনে হয় যে কোন জার্ম্মান মনস্তত্ত্ববিদের যে কোন একখানা বই খুলে আত্মপরীক্ষায় বসলেই ফুল-মার্কস পাবে। তোমার বোকামির প্রতিভা আছে।

গলায় দড়ি দেওয়া ভাল নয়। তবু অনেকেই গলায় দড়ি দেয়। গলায় দড়ি দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে অন্যমনে কখন যে গলায় দড়ি দিয়ে বসে টেরও পায় না। টের পায় না মানে,—মানে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ,—গলায় দড়ি দিলে আর কি করে টের পাবে? কিন্তু তোমার জ্বালায় আর দশজনের মত স্বাভাবিক ভাবে গলায় দড়ি পর্য্যন্ত আমার দেওয়া হল না। তুমি আমার শনিগ্রহ, মরবার আগে এতলোক থাকতে তোমার উপরেই রাগে গা

জ্বলে যাচ্ছে। আমি গলায় দড়ি দেব আর তুমি ভাববে তোমার জন্য আমার হৃদয়ে প্রেমের ক্যান্সার হয়েছিল, যাতনা সহ্য করতে না পেরে কয়েক হাত লম্বা একটা দড়ি ধরেই স্বর্গে চলে গেলাম—একথা ভাবছি আর সাধ হচ্ছে আগে তোমাকে খুন করে তার পর নিজের যা হয় ব্যবস্থা করি। আমাকে নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা চলবে জানি, অনেকে অনেক রকম থিয়োরি বার করবে, কিন্তু আমি তা গ্রাহ্যও করি না। যার যা খুসী ভাবুক, যা খুসী কল্পনা করুক,— কিন্তু এ জগতে একজনও যদি বিশ্বাস করে যে, প্রেমের জন্য তরঙ্গ গলায় দড়ি দিয়েছে, গলায় দড়ি দিয়ে তবে তরঙ্গের লাভ কি?

তুমি আমাকে অনেকদিন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জান, অন্ততঃ তোমার বোঝা উচিত প্রেমের জন্য বুকভরা ঘেন্না পোষণ করা ছাড়া তরঙ্গের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয় অথচ তুমিই বিশ্বাস করবে, তরঙ্গ আত্মহত্যা করেছে প্রেমের জন্য! তুমি এতবড় হাঁদা।

এত লোক থাকতে এই জন্যই তোমার নামে এতবড় একখানা চিঠি আমাকে লিখে রেখে যেতে হল। চিঠিখানা ঠিক কতবড় হবে এখন অবশ্য আমি তা জানি না, কিন্তু মস্ত বড়ই যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্য্যন্ত প'ড়। তোমার মত বোকা হাবাকে, কি জন্য গলায় দড়ি দিলাম, ছুচার কথায় বোঝান আমার কর্ম্ম নয়। ভুল বোঝার

পাথরে শান দিতে দিতে তোমার বুদ্ধির তরোয়ালের ধারাল দিক্‌টা এমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে যে, ভোঁতা দিকটার ধার বেশী হওয়ায় বুদ্ধিকে তোমার উল্টা ভাবে ব্যবহার না করে উপায় নাই।

রাগ করলে? রাগ কর না। যেমন বুদ্ধিই হোক তোমার বুদ্ধি আছে একটুকু যে স্বীকার করে নিয়েছি তাই খুব বড় প্রশংসা বলে ধরে নিও। কে জানে, হয়ত তোমাকে একটু মায়া করি বলেই তোমাকে বুদ্ধিমান্‌ মনে করতে ইচ্ছা হচ্ছে। মমতাই মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা।

অনুপম, মায়া-মমতার নামেই মেয়েদের মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, আর ওঠে মেয়ে-ছেলেদের মন, যারা ছেলে কিন্তু পুরুষ নয়। তোমার মনটা যদি আমার এই মায়া করার কথায় ছ্যাঁৎ করে ওঠে, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের গায়ে একটা ছ্যাঁকা দিও। এ মায়া-মমতা প্রেম নয়। তরঙ্গ প্রেমের ধার ধারে না।

তোমার কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, কি করে যে কি হল, আমি ভাল বুঝতে পারছি না। কেবল এটুকু বুঝতে পারছি, অনেক যত্নে যে তাসের ঘর রচনা করেছিলাম, আমার নিজের নিশ্বাসে হুড়মুড় করে সে ঘর ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কাল-নাগিনী যে, নিজের লেজ কামড়ে নিজের মাথার বিষে নিজেই আমি মরে গেলাম। বিষটা মাথায় থাকলে হয় ত বাঁচতাম, অমন অনেকেই বেঁচে আছে, বিষটা

তাদের কাছে অমৃতের সমান, কারণ, ওই বিষ দিয়ে অপরকে মেরে ফেলা যায়—এই হিংসার যুগে এতবড় পরিতৃপ্তি যা দিতে পারে সে বিষ অমৃত বৈ কি! কিন্তু আমার মাথাটা খারাপ কি না, নিজের বিষদাঁত তাই নিজের উপরেই ব্যবহার করে নূতন একস্‌পেরিমেণ্ট করতে গেলাম।

তুমি জান আমার জীবনটা কি রকম খাপছাড়া। আমি নিজে খাপছাড়া মানুষ বলে আমার জীবনটা খাপছাড়া হয়েছে অথবা আমার জীবনটা খাপছাড়া বলে আমি খাপছাড়া হয়েছি, এসব ধাঁধাঁ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এসব হল আমার নিজস্ব ধাঁধাঁ। আমার ধাঁধাঁ আমারই থাক, সময়মত দড়ির ফাঁসে আচ্ছা করে বাঁধব। তোমার প্রেম ছাড়া আমার গলায় দড়ি দেওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে—এ ধাঁধাঁটা তোমার। তোমার ধাঁধাঁটার জবাব শুধু আমি দিয়ে যাব।

আমি জবাব দিয়ে না গেলে তুমি নিজে নিজে যে জবাবটা ঠিক করে নেবে, মরে গেলেও আমার তা সহ্য হবে না অনুপম।

বাবা মোটা মোটা বই পড়তেন, মোটা মোটা কথা বলতেন। বইয়ের কথা কলেজের ছেলেদের বলার জন্য পারিশ্রমিকও পেতেন মোটা। মেজাজটাও বাবার ছিল তাই গরম। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে বাবা যখন হাই-স্পীডে সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা, জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের তত্ত্ব-কথা আমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে শোনাতে শোনাতে রেগে আগুন হয়ে উঠতেন, আর আমার ভবিষ্যৎ স্বামী ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জীবন,

সভ্যতা, ধর্ম্ম, সমাজের তত্ত্ব-কথা বাবাকে শোনাতে শোনাতে ক্ষেপে যেতেন, তখন দু'জনকে দেখেই আমি হয়ে যেতাম মুগ্ধা। বাবার জন্য অনুভব করতাম, গভীর শ্রদ্ধা, ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য অনুভব করতাম গভীর প্রেম। না, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেম নয়। আমার বাবা অথবা আমার ভবিষ্যৎ স্বামী দুজনের একজনও, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেমে বিশ্বাস করতেন না। প্রেম সম্বন্ধে বাবার মত ছিল, সাতজন জার্ম্মান প্রেম-বিশেষজ্ঞের মত বাতিল করা নূতন একটা মত, আর স্বামীর মত ছিল ঐ সাতজন জার্ম্মান ভদ্রলোকের মতকে স্বদেশী ছাঁচে ঢেলে নিলে যা দাঁড়ায়, তাই। অর্থাৎ অনুবাদ নয় মর্ম্মানুবাদ। এইজন্য ভবিষ্যৎ স্বামীর মতটাই আমার বেশী ভাল লাগত।

কেবল প্রেম নয়, সব বিষয়েই আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর এ রকম মর্ম্মানুবাদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। আসলে, এই জন্যই সে মহাত্মাকে আমি আমার স্বামী হবার অধিকার দিয়েছিলাম।

নতুবা তরঙ্গ হেন মেয়ে, জগতে আর জোড়া নেই, পৃথিবীর আর সব মেয়ে বক হলে যাকে কেবল হংসী নয়, রাজহংসী বলা ছাড়া উপায় থাকে না, সেই তরঙ্গের স্বামী কি যে-কেউ হতে পারে, ও রকম মহাপুরুষ ছাড়া?

হে সিগারেটপায়ী অভিমানী বালক অনুপম, কোথায় লাগ তুমি আমার সেই স্বামীর কাছে! তার তুলনায় তুমি কীটাণু-

কীট। তুমি হলে খবরের কাগজে নিউজ ট্রানস্লেটরের ইংরাজী খবরের ট্রানস্লেসন, আমার তিনি ছিলেন গল্পে কবিতায় সাহিত্যিকের ইংরাজী সাহিত্যের মর্ম্মানুবাদ। রূপকটা বুঝতে পারলে? আর একটু পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি খাঁটি ভারতীয় প্রথায় খাঁটি বিলাতি ফিল্মের ষ্টারদের মত হাসতে পারতাম বলে তিনি আমার প্রেমে পড়েছিলেন, আর তুমি আমার প্রেমে পড়লে আমি যখন খাঁটি বিলাতী প্রথায় দেশী ফিল্মের ষ্টারদের মত হাসতে শিখেছি।

বাড়িয়ে বলিনি। ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্মদিনে ভবিষ্যৎ স্বামী আমায় বললেন, জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট চাই তরঙ্গ।

আমি বললাম, কি চাই? মোটে তো বেজেছে নটা, আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।

তিনি বললেন, ওসব প্রেজেন্ট নয়। আমার সঙ্গে একা সিনেমায় যেতে হবে।

আমি বললাম, চলুন।

তিনি বললেন, তোমার বাবাকে বল।

আমি মুচকে হেসে বললাম, বাবাকে আবার কি বলব? আমার তেমন বাবা নন যে, খারাপ লোকের সঙ্গে সাড়ে নটার শোতে সিনেমায় গিয়ে নিজের ভালত্ব বজায় রাখতে পারব না ভেবে ছটফট করবেন। জানেন, আমি বাবার হাতের মানুষ করা তরঙ্গ?

সিনেমা দেখিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রোপোজ করলেন।

বললেন, আমার হাসি অমুকের মত, কাসি অমুকের মত, চোখ অমুকের মত, মুখ অমুকের মত, কথা অমুকের মত, চলন অমুকের মত। অমুকরা সবাই ফিল্‌ম-ষ্টার নয় বলে নাম করলাম না।

তারপর তুমি কবে আমার কাছে প্রথম বিহ্বল হয়েছিলে মনে আছে? আমাকে দেশী ফিল্‌ম দেখিয়ে যেদিন বাড়ী ফিরতে চাওনি, সহরতলীতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে। তুমিও সেদিন গদগদ হয়ে বলেছিলে, আমি না কি অনেকটা অমুকের মত।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার অমুকটির ফি কত করে?

তাতে কি গভীর আঘাতই তোমার লেগেছিল।

একবার গঙ্গার ঘাটে ছোট একটা ছেলে জলে ডুবে মরবার আবদার ধরায় তার মাকে তার গালে চড় মারতে দেখেছিলাম। ছেলেটা যে ভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠবার উপক্রম করেও কাঁদেনি, ভাবপ্রবণতায় ডুবে মরতে গিয়ে আমার কথার মার খেয়ে তুমিও সেদিন তেমনি মুখভঙ্গি করেছিলে।

আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি গলায় দড়ি দিয়েছি শুনে তুমি নিশ্চয়ই সেই রকম মুখভঙ্গি করবে।

যদি একবার দেখতে পেতাম!—

মনে ক'র না যে, দেখতে পেলেও কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোন লাভ হত। রোমান্টিসিজ্‌ম-এর মিথ্যা

মানস-সরোবরে ডুবতে না দিলেই যে তোমার মহা উপকার সাধন করা হবে, সে ভুল ধারণা আমার ভেঙে গেছে। ওরকম ডুবে মরবার সঙ্গে রিয়ালিজম্-এর কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে মরার তফাৎ আছে, কিন্তু দুটোই অপমৃত্যু। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা আর দু'দিন পরে তোমার টি. বি. হয়ে রক্ত বমি করতে করতে মরার মধ্যে কত তফাৎ—অথচ দুটোই কি শোচনীয় অপমৃত্যু! আমি গলায় দড়ি দিয়েছি শুনে তুমি প্রচণ্ড একটা আঘাত পাবে, সে আঘাতে অসার অর্থহীন অবাস্তব কল্পনার জগৎ থেকে তুমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে,—আগে এ কল্পনায় আমার আনন্দ জাগত, চড়-খাওয়া ছেলের মত তোমার মুখভঙ্গী দেখে আমার লাভ হত এই যে, মনে ভাবতাম এ জগতে অন্ততঃ একজনের একটু কাজে লেগেছি, আর দশজনের মত আগাগোড়া ব্যর্থ জীবন আমার নয়!

কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি, ও ভাবে তোমাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনার কোন দাম নেই, আনবার অধিকার আমার নেই। তোমাকে বাঁচবার পথ আমি দেখাতে পারব না। আমি নিজেই সে পথ জানি না। আমি নিজে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি, তোমাকে আমি কি করে বলব ওই কাব্যের ঝঙ্কারময় ফুল-বিছানো পথ ধরে যেও না, এই কার্য্যের কোলাহলময় বন্ধুর পথ ধরে এস, এই পথে জীবনের সার্থকতা? কোন্‌টা কাব্যের ঝঙ্কার, কোন্‌টা কার্য্যের কোলাহল, কোন্‌টা

ফুল, কোন্‌টা পাথর, কোন্‌টা পথ, কোন্‌টা বিপথ, কোন্‌টা জীবনের সার্থকতা, কোন্‌টা ব্যর্থতা, এ সব আমার কাছে গোল-মাল হয়ে গেছে,—মানুষ কি, মানুষ মানুষ কেন, জীবনে মানুষ কি চায়, আর কেন চায়, কি পায়, আর কেন পায়, কি উচিত, আর কেন চাওয়া উচিত, এসব এমন উদ্ভট সমস্যায় পরিণত হয়ে গেছে যে, আমি বুঝতেও পারছি না, এগুলি সত্যিই সমস্যা না আমার মাথার মধ্যে এমন কোন পাগলামি বাসা বেঁধেছে, যার জন্য সহজ সোজা কথাগুলিকে বিকৃত করে দেখছি! অথচ কিছুদিন আগেও আমি ভাবতাম জীবনের অনেকগুলি ধাঁধাঁর জবাব আবিষ্কার করেছি, আর কিছুদিন চেষ্টা করলে বাকীগুলিও আবিষ্কার করে ফেলতে পারব। কিছুদিন আগে আমার মনে যখন আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগে, তখনও কি রকম অদ্ভুত কথা সব ভাবতাম শোন। ভাবতাম, জীবনকে ধাঁধাঁ না জেনে ধাঁধাঁগুলি সত্যিই জীবনের না পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ধাঁধাঁ সে হিসাব না করে, ধাঁধাঁর জবাব আবিষ্কার করার মত এই বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়েই কি আমি জন্মেছি? আমার রক্তের মধ্যেই কি এই অসাধারণ ক্ষমতা মিশে ছিল? অথবা আমি জন্মে থেকে যে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছি, তাই আমাকে এমন অসম্ভব রকমের ক্ষণজন্মা নারীতে পরিণত করেছে?

আজ কিন্তু নিজেকে হাজার বার প্রশ্ন করে একটা অতি সহজ ধাঁধাঁরও জবাব পাই না অনুপম। কিছুকাল ধরে একটা

জিজ্ঞাসা আমার মনকে লাঙ্গলের মত চষে বেড়াচ্ছে। অথচ কারও কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাবার ভরসা আমার নেই। আমি কি ভাবছি জান? ভাবছি, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে-রকম শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে আমি বড় হয়েছি, সে সব তো সৃষ্টিছাড়া নয়, অনেকেই তো ও রকম অবস্থায় ও রকমভাবে মানুষ হয়, তবে কেবল আমার বেলাতেই এ রকম অঘটন ঘটল কেন? আমি কেন এমন সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলাম আমার যা আয়ত্তের বাইরে, বুদ্ধির অগম্য, সাধ্যের অতীত? কেন আজ আমার মানসিক অবস্থার এমন বিপর্য্যয় ঘটল যে, পৃথিবীতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে নিজেকে আমার মেরে ফেলতে হচ্ছে?

অনুপম, তোমাকে এই কথাগুলি লিখতে লিখতে আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে। সত্যই কি আমি এ-রকম হয়ে গেছি? খানিক আগে নিজেকে আমি যে খাপছাড়া বলেছি, সত্যই কি আমি তাই?

যে সব কারণ আমাকে এ রকম করেছে, হয়ত আরও অনেককে সেই সব কারণেই আমার মত করে তুলেছে? তাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য হয়ত কেবল তুচ্ছ খুঁটিনাটির—সমস্ত মানুষের মূর্ত্তি একরকম হলেও প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন পার্থক্য থাকে, সেই রকম একটা স্বাতন্ত্র্য? অনুপম, কে জানে হয়ত আমার গলায় দড়ি দেবার আসল কারণ যা, আজ পর্য্যন্ত আরও অনেকের গলায় দড়ি দেবার কারণও

তাই ছিল ? হয়ত যে শক্তি আমাকে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দিয়েছে, সেই শক্তি তাদেরও আত্মহত্যার প্রেরণা জুগিয়েছিল,—আমরাই কেবল ধরতে পারছি না, সেই শক্তিটার স্বরূপ কি এবং কিভাবে, কখন, কোথায় কিসের ছদ্মবেশে সে কাজ করে ?

আমি তোমাদের বাড়ীতে থাকবার সময় পাড়ার ভূদেব বাবুদের বাড়ীতে একটা ছেলে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। তুমি আমায় এসে বলেছিলে, ছেলেটার কুৎসিত রোগ হয়েছিল বলে সুইসাইড করেছে তরঙ্গ। ভালই করেছে ওরকম ছেলের মরাই ভাল।

আমি মুচকে হেসে বলেছিলাম, হয়তো তা নয় অনুদা, হয়তো ক'বছর ধরে পরের অন্নজল পেটে দিয়ে দিয়ে আর ভাল না লাগায় মুখ বদলাতে স্বর্গে গেছে। কুৎসিত রোগ আবার কিসের ? দেখতে, উপার্জ্জনের উপায় থাকলে কুৎসিত রোগ নিয়েই বিয়ে-থা করে ছোঁড়া দিব্যি সংসার করত।

আরও কি যেন সব তোমায় বলেছিলাম। অনুপম হয়ত সেই ছেলেটা যেজন্য আত্মহত্যা করেছিল, আমিও সেইজন্যই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি ? আমার কুৎসিত রোগ নেই, পরের অন্নজল আমায় পেটে দিতে হয় না, কিন্তু আমি ভাবছি কি জান, সংসারে আমি তো একা নই, দশজনের মধ্যে আমার বাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আর দশ জনের মধ্যে যে ভাবে কাজ করে, আমার মধ্যেও তেমনি ভাবে কাজ করে। এ হিসাবে ধরলে জগতের সমস্ত মানুষের

ভাগ্য পরস্পরের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত; জগতের কোথাও একটিমাত্র মানুষ যদি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে সেটাকে আমরা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারি না, তার আত্মহত্যার কারণ সমগ্র জগতে নানা রকম রূপ নিয়ে ছড়িয়ে থাকবেই থাকবে। তাই যদি হয় অনুপম, তাহলে হয়ত ভূদেব বাবুর বাড়ীর ওই বেকার ছেলেটার জীবনে তার জন্ম থেকে,—হয়ত তার জন্মের অনেক যুগ আগে থেকেই যে সব কার্য্য-কারণের সমাবেশ শেষ পর্য্যন্ত তার আত্মহত্যায় পরিণতি লাভ করেছিল,—আমার জীবনেও সেই কার্য্য-কারণগুলির সমাবেশ আমাকেও আত্মঘাতিনী করাতে চলেছে? কিন্তু কোথায় এই যোগসূত্র? সেই ছেলেটার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমস্ত পৃথিবীর নরনারী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা জলবায়ু মাটি,—এমন কি, হয়ত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও,—মধ্যস্থতায় প্রকৃতির নিয়মে স্থাপিত হয়ে আছে, কি তার স্বরূপ? আমি তো তা জানি না অনুপম! তোমাকে এই কথা কটা লিখতে গিয়েই আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে। আমার সে বুদ্ধি কই যা দিয়ে আমি এই যোগসূত্রের মূলতত্ত্ব জানব? জানি না বলেই মনটা আমার খুঁত খুঁত করছে যে, হয়ত যা ভেবে আমি গলায় দড়ি দিতে চলেছি, তাও ভুল—কি যে ভুল নয় আমার তা বুঝবারও ক্ষমতা নেই। আছে?

তবে কি জান অনুপম, বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব,

এইটুকু সান্ত্বনা আমার আছে। যে সব কারণে গলায় দড়ি দেওয়া আমি উচিত মনে করেছি, তার সবগুলি ভুল হলেও এ কথাটা সত্য যে তোমাদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে বেঁচে থাকার মত শিক্ষা আমাকে কেউ দেয় নি, আমাকে মরতেই হবে।

এতদিন সংস্কারের ও সংশোধনের কল্পনা নিয়ে চারি দিকে তাকাতাম, তাই যা দেখতাম তা সহ্য হত, সাময়িক বলে অনেক কিছু স্বীকার করে নিতাম, ভাবতাম আমি যেটুকু দেখছি, সংসারে তার চেয়ে খুব বেশী শ্রী ও সামঞ্জস্যের অভাব থাকা সম্ভব নয়, মানুষ আসলে মানুষই আছে, বাঁচবার নিয়মও মানুষ মোটামুটি জানে, কেবল নিজের বোকামির দোষে মানুষ কিছু মনুষ্যত্ব হারিয়ে পেয়েছে কিছু পাশবিকতা, আর বাঁচবার কয়েকটা নিয়ম পালন করতে ভুল করে জীবনে এনেছে কিছু গণ্ডগোল।

ও মা, শেষে দেখলাম ভুলটা আমারই!

সকলের জীবনেই আজ অন্যায় বেশী, অভাব বেশী, অপরাধ বেশী, অনাচার বেশী, বিশৃঙ্খলা বেশী। মানুষ যদি সজ্ঞানে জীবনে এ সব সঞ্চয় করত, তারও একটা মানে বোঝা যেত, না জেনে না বুঝে মানুষ নিজের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মহা আড়ম্বরের সঙ্গে করছে নিজের সর্ব্বনাশ। অন্ধ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে অন্ধকে। যারা এরকম করছে তারাই আবার দশজনকে উপদেশ দিচ্ছে, এই কর, ওই কর, তাই কর। কি অবস্থায় আজ আমরা এসে পড়েছি জান অনুপম?

জীবনকে যে সুন্দর করতে চায়, নিখুঁত করতে চায়, পরিপূর্ণ করতে চায়, তার সমস্ত চেষ্টা পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—জীবনে সার্থকতা লাভের পথটিও খুঁজে পাচ্ছে না, তার নিজের ভিতরের আর বাইরের অসংখ্য বিরুদ্ধ-শক্তি ঘাড়ে ধরে তাকে বিপথে ঠেলে নিয়ে গেলে বাধাও সে দিতে পারছে না।

যেমন আমি।

কি শিক্ষাই আমার বাবা আর আমার স্বামী আমাকে দিলেন। জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল আলেয়ার মত, না লাগল সে আলো জগতের কারও কাজে, না লাগল আমার নিজের কোন্ উপকারে। বিপথে বিপথে ঘুরিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই টেনে নিয়ে চলল অপমৃত্যুর দিকে।

তরঙ্গের চিঠিখানা অসমাপ্ত।

বেশ বোঝা যায়, তরঙ্গ আরও অনেক কথা লিখিয়াছিল, কিন্তু কে যেন চিঠির বাকী অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে। খামটি খোলা ছিল, কি বন্ধ ছিল, প্রথমে অনুপম লক্ষ্য করে নাই। এবার খামখানা একটু ভাল করিয়া দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, কে যেন অপটু হাতে জল দিয়া ভিজাইয়া খামটি খুলিয়াছিল, তারপর একান্ত অবহেলার সঙ্গে আবার বন্ধ করিয়াছে।

সীতা স্বীকার করিলেন, 'হ্যাঁ, আমি খুলেছিলাম চিঠিটা। কিছু মনে করছ না তো ? কদিনে যা ভালবেসেছিলাম মেয়েটাকে অনু, না খুলে থাকতে পারলাম না।'

অনুপম বলিল, 'চিঠির শেষটা কোথায় গেল ?'

সীতা নির্ব্বিবাদে বলিলেন, 'আমি ছিঁড়ে নিয়েছি।'

'কেন ?'

'মরবার সময় ঝোঁকের মাথায় একটা মেয়ে যা-তা লিখে রেখে গেছে, সকলকে কি তাই পড়তে দেওয়া যায় ? তুমিই বল, যায় ?'

'কিন্তু লিখে তো গিয়েছিল আমাকে ? আমার চিঠি আপনি খুলে পড়লেন, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলেন না ! তারপর আবার চিঠির অর্দ্ধেকটা রেখে দিলেন ছিঁড়ে ! নিয়ে আসুন, কোথায় রেখেছেন।'

সীতা নির্ব্বিবাদে বলিলেন, 'সে কি আর আছে ? সে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।'

তরঙ্গের মৃত্যুর আঘাতটাই খিলের মত এতক্ষণ অনুপমের মনের রাগটাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, এবার সে যেন রাগে দিশেহারা হইয়া গেল। ক্রোধের বশে মানুষ খুন করিবার আগে খুনী যে ভাবে তাকায়, তেমন দৃষ্টিতে সীতা পিসীমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'পুড়িয়ে, ফেলেছেন ? ইয়ার্কি পেয়েছেন না কি আপনি, এঁ্যা ?'

সীতা যে গুরুজন সে কথা ভুলিয়া একটা বিশ্রী গালও

অনুপমের জিভের ডগায় আসিয়াছিল, কত কষ্টেই সে গালটা সে চাপিয়া রাখিল।

সীতা পিসীমার আজ ভাবান্তর আসিয়াছে। আজ যেন তিনি শান্ত, সহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী মহিলা,—কথায় ব্যবহারে কোন রকম পাগলামি নাই, বরং তরঙ্গের চিঠির শেষাংশ ছিঁড়িয়া লওয়ার জন্য অনুপম যে রাগারাগি করার মত ছেলেমানুষী পাগলামি আরম্ভ করিবে, অনেক দিন আগে হইতে, তরঙ্গের গলায় দড়ি দেওয়ারও আগে হইতে, তিনি যেন তাহা জানিতেন এবং অনুপমকে সামলাইবার ভারটাও তখন হইতেই তিনি যেন গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। ধীর স্থির গম্ভীর গলায় বলিলেন, 'ছেলেমানুষী ক'রো না অনুপম। তরঙ্গ চিঠিখানা আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিল, ইচ্ছে করলে সমস্ত চিঠিটাই তো আমি তোমাকে না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পারতাম? তাই ইচ্ছে ছিল আমার, নেহাৎ তরঙ্গের শেষ কথাটা একেবারে ঠেলতে পারলাম না বলে অর্দ্ধেকটা তোমায় দিয়েছি। হ্যাঁ অনুপম, তরঙ্গ যে এভাবে আমাদের ছেড়ে গেল, তার চেয়ে তরঙ্গের চিঠির খানিকটা পড়তে পারলে না, এটাই কি তোমার কাছে বড় হল?'

অনুপম ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'এমনি ভাবে ছেড়ে গেল বলেই তো চিঠির সবটা পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কি লিখেছিল বাকীটাতে?'

'সে তোমার জেনে কাজ নেই।'

সীতাকে কোনমতেই বলান গেল না। পেটে কথা রাখা সীতার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু অনুপমকে চিঠির বাকী অংশে তরঙ্গ যে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেই কথাগুলি তিনি বোধ হয় একেবারে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিল না।

কেবল এইটুকু জানা গেল, তরঙ্গের বাকী কথাগুলি ভাল নয়। নিজেকে আর জগৎশুদ্ধ মানুষকে সে বড় খারাপভাবে গালাগালি দিয়াছে। নিজের সম্বন্ধেও এমন কতকগুলি কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে—

'কি সেই কথাগুলি ?

'আমি তা বলতে পারব না বাবু।'

তরঙ্গের প্রকৃতি যে স্বাভাবিক ছিল না, সীতা দয়া করিয়া অনুপমকে তার চিঠির যেটুকু অংশ দিয়াছিলেন, সেটুকু পড়িলেই তা বেশ বোঝা যায়। আরও অনেকের মাথাও যেন তরঙ্গ কম-বেশী খারাপ করিয়া দিয়া গেল। সকলের জীবনে এমন একটা সমস্যা, এমন একটা রহস্য, এমন একটা অভূতপূর্ব্ব প্রভাব সে বিস্তার করিয়াছিল যে, সকলের মনের তলে তলে তার নাটকীয় আত্মলোপের আঘাতটা যেন—তার কথা ভুলিয়া থাকিবার সময়ও—চোরের মত সিঁদ কাটিয়া বেড়াইতে লাগিল, সুখশান্তি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে কারও মনে, অপহরণ করিবে।

অন্য কারও মনে সুখশান্তি থাক বা নাই থাক, অনুপমের মনে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কি লিখিয়া রাখিয়া

গিয়াছিল তরঙ্গ ? যে ধাঁধাঁ তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, তার কি মীমাংসা সে নিজেই করিয়া দিয়া গিয়াছিল, সীতা পিসীমা যাহা আগুনে সঁপিয়া দিয়াছেন ? ক্রমে ক্রমে সীতা পিসীমার কথাই যেন সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তরঙ্গ যে এভাবে তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, তার চেয়ে তরঙ্গের শেষ চিঠির শেষটা যে সে পড়িতে পারিল না, এটাই অনুপমের কাছে বড় হইয়া উঠে। সীতা পিসীমার কাছে সে মিনতি করে, রাগারাগি করে, ভয় দেখায়, আবোল-তাবোল বকে—কিন্তু দেখা যায়, সীতা এবিষয়ে বড় শক্ত।

'না আমি বলব না। কেন এ রকম করছ অনুপম ?'

'সবটা না হয়, আভাসে একটু বলুন ?'

'তাও বলব না।'

শঙ্কর কয়েকদিন ঝিমাইল। তরঙ্গ অনুপমকে চিঠি লিখিয়া গিয়াছে দেখিয়া হঠাৎ শঙ্করের মনে প্রবল আঘাত লাগিয়াছে, তরঙ্গকে কিছুদিন হইতে তার ভাল লাগিতেছিল না,—তবু। সে থাকিতে অনুপমকে চিঠি কেন ? তবে কি অনুপমের জন্যই তরঙ্গ তাকে অপমান করিয়াছিল ? সে থাকিতে অনুপমকে যখন চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তখন আর কি অর্থ হয় তরঙ্গের ব্যবহারের ?

মনটা যখন শঙ্করের এই সব কথা ভাবিয়া অত্যন্ত খারাপ, একদিন লীলাময় ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া বলিলেন, 'টাকা আছে শঙ্কর ? মিসেস সেন কিছু টাকা চাচ্ছেন।'

'মিসেস সেন কোথায় ?'

'সেইখানে। তোমাকেও যেতে বললেন।'

'কত টাকা চাচ্ছেন ?'

এমন ভাবে শঙ্কর কথাটা জিজ্ঞাসা করিল, যেন টাকার ভাণ্ডার তাহার অফুরন্ত, যত চাও ততই পাইবে।

লীলাময় একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'কিছু বেশী করে নিয়ে যেতে বললেন, বললেন, বড্ড দরকার, সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন।'

সেই হোটেলের সেই ঘরে সেই আবহাওয়া সেই রকম আনন্দোচ্ছল মিসেস সেন বন্ধু-বান্ধবকে আমোদ যোগাইতে-ছিলেন। লীলাময়ের চোখের ইসারায় একটু আড়ালে আসিলেন।

শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকা চাই ?'

মিসেস সেন মধুর হাসিয়া বলিলেন, 'দরকার তো ছিল অনেক টাকার, তুমি কত দিতে পার তাই বল না !'

'এক শ'।'

'মোটে ? আচ্ছা তাই দাও।'

শঙ্কর বলিল, 'আজ তো সঙ্গে নেই। কাল দেব।'

'কাল কখন ?'

'শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটা মিটিং আছে না কাল,—আপনিও তো লেকচার দেবেন দেখলাম খবরের কাগজে—দেবেন না ?'

মিসেস সেন মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

শঙ্কর বলিল, 'আমিও একটা লেকচার দেব ভাবছি। লেকচার দিয়ে আপনাকে টাকাটা দেব।'

শুনিয়া মিসেস সেন গম্ভীরমুখে লীলাময়ের দিকে চাহিলেন। লীলাময় অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন, 'কি বলবে না বলবে আগে থেকে ঠিক না করে এ রকম হঠাৎ লেকচার দেওয়া—'

শঙ্কর শান্ত ভাবেই বলিল, 'পাগলামি করব না, ভয় নেই। যা বলা চলে তাই বলব, আপনাদের লেকচারের দাম কমবে না। ও সব ছেলেমানুষী আমার কেটে গেছে।'

লীলাময় তবু বিপন্নভাবে বলিলেন, 'কালকের মিটিংটা থাক্ না? এর পরের মিটিংটাতে তোমায় যদি বলতে না দিই, তা হলে কি বলছি। সেই ভাল হবে, কেমন? আগে থেকে খবরের কাগজে তোমার নাম বার করে দেব, যা বলবে পরদিন কাগজে সভার রিপোর্টে তারও খানিকটা—'

শঙ্কর বলিল, 'কেবল কথায় কি চিরকাল চিড়ে ভেজে লীলাময়বাবু! দিন না, এখুনি ফোন করে দিন না কাগজের আপিসে, আমার নামটা আপনাদের নামের সঙ্গে বক্তার লিষ্টে ছাপিয়ে দিতে। পরশু যদি মিটিংএর রিপোর্টে আমার নামটাও যায়, আর কিছু টাকা না হয় বেশীই দেব।'

মিসেস সেন আর লীলাময়ের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল। মিসেস সেন শঙ্করের বাহুমূল ধরিয়া আদরের আর আব্দারের সুরে বলিলেন, 'কেন এ রকম করছ শঙ্কর? কালকের মিটিংটা থাক না? এমন কত মিটিং হবে। আমি নিজে—'

কিন্তু শঙ্কর একটু পাথর বনিয়া গিয়াছে, তাকে কোন রকমেই দমান গেল না। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

কেবল খবরের কাগজের আপিসে ফোন করলেই চলে না, দলের আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গেও একটু কথাবার্ত্তা হওয়া দরকার,—কাল যদি তাঁহারা দলের বাহিরের এক ছোকরাকে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ছেলেখেলা করিতে দিতে আপত্তি করেন, যদি লীলাময়ের উপর সকলে চটিয়া যান ?

চিন্তিত মুখে লীলাময় বলিলেন, 'বড় হাঙ্গামায় ফেললে। অনেকগুলো ফোন করতে হবে। এখানে তো মাগনা ফোন নেই।'

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, 'চলুন না ফোন করবেন, ফোনের পয়সা আমি দেব।'

মিসেস সেনও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আর আজকের ফূর্ত্তির পয়সা ?'

শঙ্কর বলিল 'তাও দেব।'

পাকিয়া যেন একেবারে ঝানু হইয়া গিয়াছে শঙ্কর। নাম করার, বড় হওয়ার, প্রসিদ্ধি-লাভের সমস্ত কলাকৌশল যেন তার নখদর্পণে। সে জানে, আরও অনেক কিছুই লীলাময়, মিসেস সেন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গের পাবলিক্ লাইফ্-এর পিছনে আছে,—আরও কদর্য্য, আরও কুৎসিত, আরও জটিল। কিন্তু এ কথাও সে জানে যে, যতটুকু জ্ঞান সে অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, সেটুকু ঠিকমত প্রয়োগ করিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে আরও যত কিছু জানিবার আছে সবই সে জানিতে পারিবে এবং জানিতে পারিয়া প্রয়োগ করিতে পারিবে নিজের প্রগতির উদ্দেশ্য।

প্রগতি? ভাবপ্রবণ মন শঙ্করের, মিসেস সেনের ঈষৎ-বিস্মিত দুষ্টামিভরা চাহনি ও হাসি, সাঙ্গোপাঙ্গের বীভৎস রসিকতা এবং অতৃপ্ত ক্ষুধিত অন্তরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা,—সব একটা বিপরীত ভাব জাগাইয়া তোলে শঙ্করের মনে,—গায়ের জোরে যে মনের ক্রিয়াকে এখানে সে ঘটাইয়া চলিয়াছে, অতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াও মন জুড়িয়া দাপাদাপি করিতেছে। এই কি প্রগতি? এক দিন না হয় সে নিজেকে করিয়া তুলিবে খ্যাতনামা, লোকে না হয় কয়েক মিনিট মনে রাখিবার জন্য সাগ্রহে তার কথা শুনিবে, কিন্তু কি হইবে সেই সাফল্যে? দামী পোষাক গায়ে দিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে কুৎসিত ব্যাধিই যদি তাকে সঞ্চয় করিতে হয়, কি করিবে সে দামী পোষাক দিয়া?

গভীর রাত্রে গভীর বেদনায় শঙ্করের ঘুম আসে না। এখন শুধু প্রতিক্রিয়া চলিতেছে কি না, বিষাদটা তাই বড় কটু। জীবনের রাজপথ খুঁজিয়া না পাইয়াও গলিঘুঁজি দিয়াই তো এতকাল সে খুসী মনে আগাইয়া আসিয়াছে, আজ শ্যাওলা-পিছিল নর্দ্দমা দিয়া হাঁটিবার সখ মিটাইতে গিয়া একটি মাত্র আছাড় খাইয়াই যেন সর্ব্বাঙ্গে টনটনে বেদনা ধরিয়া গেল।

শঙ্করের মা তরঙ্গের ব্যাপারটা লইয়া ক্ষেপিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া দিলেন। একেই একটু স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত মানুষ, সর্ব্বদা অস্বাভাবিকতার মধ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাটা

চাপিয়া চলিতে চলিতেই তাহার প্রাণান্ত হয়, তার উপর এত বড় একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। বিনা অসুখে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি শীর্ণ হইয়া গেলেন, তারপর হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিলেন,—রাগারাগি, চেঁচামেচি, গালাগালি আর মাথা কপাল কোটা। এটা শঙ্করের মার পক্ষে অভিনব। ভীরু, ভোঁতা, জীবনীশক্তির অভাব-গ্রস্তা অকালবৃদ্ধা মানুষ তিনি, তাঁর পক্ষে এ রকম প্রচণ্ড উগ্রতা বেমানান এবং ভীতিকর।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন। কিন্তু ওষুধে কি হইবে? ওষুধের নেশায় শঙ্করের মা কেবল মড়ার মত বিছানায় শুইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। ওষুধটা অবশ্য ঘুমের, শঙ্করের মার মড়ার মত পড়িয়া থাকাটাও অবশ্য সকলে ঘুম বলিয়া ধরিয়া লইলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছেন, কার ক্ষমতা আছে তাকে প্রকৃত নিদ্রা দান করিবে?

ডাক্তার বলিলেন, 'চেঞ্জে পাঠাতে পারলে মন্দ হত না। এ সব রোগীর পক্ষে সহরের গোলমাল বড় খারাপ—বেশ একটু শান্ত নির্জ্জন অ্যাটমসফিয়ারে—'

চেঞ্জের ব্যবস্থা হইল। নামকরা একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে—যেখানে এত লোক এত রকমের ব্যারাম লইয়া চেঞ্জে যায় যে, স্থানটি হইয়া থাকে রোগের আড়ৎ আর রুগ্ন নরনারীর ভিড়ে সহরের মতই জনপূর্ণ।

শঙ্করের মা বলিলেন, 'আমি দেশে যাব। দেশের জন্য আমার মন কেমন করছে।'

বলিয়া বীরেশ্বরের পা ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বীরেশ্বর বলিলেন, 'কেঁদো না মা, কেঁদো না, দেশে যাবার জন্য কাঁদবার কি হয়েছে? কালকেই আমরা দেশে রওনা হব।'

ডাক্তার এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। বীরেশ্বর নিজে, শঙ্করের মা, সীতা আর শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া গেলেন দেশে।

দিন তিনেকের জন্য শঙ্কর অসুস্থা জননীর সঙ্গে দেশে গেল। একটা সভায় তার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, কিন্তু আর কি করা যায়, মার জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলে না। ছেলেকে ছাড়িয়া দেশে যাইতে শঙ্করের মা কিছুতেই রাজী হইলেন না, কাঁদিয়া দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ভয়ানক ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এবং ছেলের সঙ্গে দেশে যাওয়ামাত্র হইয়া গেলেন জড় পদার্থের মত শান্ত ও নির্জ্জীব। দেশের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেককাল আগে একবার যে সলজ্জ নম্রতার সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন, এতকাল পরে আবার সেই বাড়ীতে সেই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া প্রথম বধূজীবনের সরমস্নিগ্ধ নম্রতাই যেন নির্জ্জীবতায় রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দেশ দেখিয়া শঙ্কর কিন্তু পাইল আঘাত।

গ্রাম শঙ্কর দেখিয়াছে। ছেলেবেলায় এই গ্রামেও কয়েকবার সে আসিয়াছিল, ঝাপসা মনেও যেন আছে। তা ছাড়া, শহর-

তলীর গ্রামে কতবার সে বেড়াইতে গিয়াছে, ট্রেনে কোথাও যাওয়ার সময় দু'দিকে কত অফুরন্ত গ্রাম তার নজরে পড়িয়াছে, গ্রাম সম্বন্ধে কত বই সে পড়িয়াছে !

এ কি গ্রাম ? পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর বন-জঙ্গল ডোবা-পুকুর এ সব কিছুই মনের মধ্যে গ্রামের যে ছবিটি আছে তার সঙ্গে মেলে না, এখানকার মানুষগুলি তার মনের মধ্যে গ্রামের যে মানুষগুলি বাস করে তাদের স্বজাতি নয়, গ্রাম্য জীবনের যে রোমান্টিক কল্পনা মনের মধ্যে এত কাল সযত্নে পোষণ করিয়াছে, এই গ্রামে গ্রাম্য-জীবনের সঙ্গে তার পার্থক্য যেন কবিতার বই আর খবরের কাগজের।

বরং শহরের সঙ্গে এক বিষয়ে এ গ্রামের মিল আছে। এখানেও মানুষ তরঙ্গের মত আত্মহত্যা করে।

তরঙ্গের বয়সী একটি বৌ, তবে তরঙ্গের মত রূপসীও নয়, স্বাস্থ্যবতীও নয়। বাড়ীর সম্মুখে জঙ্গল, বাড়ীর পিছনে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মতই রুগ্ন ধানের ক্ষেতে স্বাস্থ্যহীন ধান গাছ, ডাইনে আমবাগান, বাঁয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীর চার ভিটার চারখানা 'পড়' পড়' ঘরের মধ্যে একখানা ঘর কবে পড়িয়া গিয়াছে আর তোলা হয় নাই। এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের প্রকাণ্ড জীর্ণ গৃহের গোয়াল-ঘরটিতে বৌটি তরঙ্গকে অনুকরণ করিয়াছে।

গোয়াল-ঘরে আজ যে অনেক কাল ধরিয়া গরু বাস করে না, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। এ বাড়ীর লোক দুধ খায় না।

এমন কি, গোয়াল-ঘরের সম্মুখে বয়স্কা রমণীর কোলে পাঁচ ছ' মাসের যে কাঠির মত ক্ষীণ খোকাটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছে, সেও খায় না। কোথায় পাইবে? গোয়াল-ঘরে দড়িতে তার যে কঙ্কালসার জননী ঝুলিতেছে, তার শুষ্ক, আলগা চামড়ার মত স্তন দুটিতে দুধ থাকা সম্ভব নয়।

## সপ্তম অধ্যায়

গ্রামে আসিয়া সহরের আসল রূপটা এতদিন যেন শঙ্করের চোখে ধরা পড়িল—সহর একটা বিরাট আশ্রম, তাপসদের আড্ডাখানা। ধ্বংসের তপস্যা করিতে মানুষ সহরে যায়, ছোট বড় অপমৃত্যুর লোভে মানুষ সহরে বাস করিতে ভালবাসে। জীবন বিস্বাদ হইলে মানুষের আসে বৈরাগ্য, জীবন বিষাক্ত হইলে মানুষের আসে সহুরে জীবনের লোভ।

সহরে যারা যাইতে পারে না, গ্রামে যাদের বঞ্চিত বন্দী জীবন যাপন করিতে হয়, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তারা গ্রাম্য জীবনেও আনিবার চেষ্টা করে যতখানি পারে সহুরে ভাব। সহরবাসী সকলের মত গ্রামবাসীরা সকলে জানিয়া শুনিয়া এটা করে না, মানুষের অত বিবেচনা-শক্তি নাই, না সহুরে মানুষ, না গ্রামের। না জানিয়া বুঝিয়া মূর্খের মত নিজেকে, নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরকে তিল তিল করিয়া বিনাশ করিয়া ভাবে জীবন যাপন করিতেছি—যথা নিয়মে, যুগধর্ম্ম অনুসারে,—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিধানের জোড়াতালি দেওয়া ফাঁদে পড়িয়া থাকার প্রয়োজন নিটানর গভীর নিরানন্দে।

গ্রামের মানুষ দেখিয়া, মাটি দেখিয়া, গাছপালা দেখিয়া, মাঠের ফসল দেখিয়া, গরু-ছাগল কুকুর-বিড়াল দেখিয়া, কেবল মানুষের

জন্য শঙ্করের মনটা খারাপ হইয়া যায়, একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা-বোধের সঙ্গে তার মনে হয়, বাঁচিবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে, অথচ মানুষ যেন বাঁচিতে চায় না। সহর ও গ্রাম কোথাও মানুষের জীবন-যুদ্ধের নিয়ম, সঙ্কেত ও কৌশলগুলি জানিবার বা শিখিবার ইচ্ছা নাই, জীবনের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া সকলে নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে একটা উদ্ভট খাপছাড়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

বাঁচিবার উপায় ও পথ থাকিতে তাহা গ্রহণ না করার আর কি মানে হয়?

কি সে উপায় ও পথ? সে নিজেও তো তার সন্ধান জানে না!

নিজের চিন্তার এইখানে যেন একটা ফাঁদ পাতা আছে—বড় কবির জীবন-দেবতার মত কৌশলী মন-ধরা জীবন-ব্যাধের আশ্চর্য্য ফাঁদ! নিজের মনটাকে শঙ্কর কত বড় মনে করে, কিন্তু চিন্তার এই ফাঁদে পড়িয়া মনটা তার করিতে থাকে চড়ুই পাখীর মত কিচিরমিচির!

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে পরিহাসের সুরে ডাকেন, 'শঙ্করবাবু!'

'আজ্ঞে বলুন।'

'আজ্ঞে বলুন!' জীবনে তো তোমার মুখে কখনো বলুন শুনিনি দাদু।'

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'গাঁয়ে এসে শিখেছি।'

'আর কি শিখেছিস গাঁয়ে এসে ?'

'শিখেছি যে বেঁচে থাকতে হলে আধপেটা খেতে হয়, ঝগড়া-মারামারি করতে হয়, খাবার পয়সা দিয়ে বিলাসিতা নেশা আর পাপ করতে হয়—'

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'থাম শালা থাম। তাইতো বলি তোকে স্বদেশী রোগে ধরেছে! তুই দেশের লোকের ভাবনা ভাবছিস! আমি এদিকে ভাবছিলাম, যার জন্যে ভেবে ভেবে কাহিল হচ্ছিস, সে ছুঁড়ীটা কে! দেশশুদ্ধ লোকের জন্য দরদ দিয়ে তুই যে বুকটা ফাটিয়ে ফেলছিস, তা কি জানতাম। এইজন্য তুই লীলাময়ের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেছিস।'

'দেশের কথা ভাবাটা অন্যায় নাকি ?'

'তোর পক্ষে অন্যায়।'

'কেন ? দেশের কথা ভাববার অধিকার আমার নেই ?'

বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'না।'

শঙ্করও তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ?'

'তোরা যত দেশের কথা ভাববি, তত দেশের সর্ব্বনাশ হবে বলে, বিনা চিকিৎসায় যত রোগী মরে, হাতুড়ের চিকিৎসায় তার চেয়ে ঢের বেশী মরে বলে। ভাবতে জানিস তুই, ভাবতে শিখেছিস ? মন তোর সুস্থ, স্বাভাবিক ? আজ পর্য্যন্ত এমন একটা কাজ তুই করেছিস, যাতে প্রমাণ হতে পারে, একটা দিনের জন্যও তোর পক্ষে অতি সাধারণ কিন্তু খাঁটি মানুষের বাচ্চা হয়ে থাকা সম্ভব ? কবিতা লিখতে চাস লেখ, প্রেম

করতে চাস কর, বিদ্বান্ হতে চাস হ, দেশের জন্য কেঁদে কেঁদে আর খ্যাপার মত আবোল-তাবোল কাজ করতে চাস কর,—কিন্তু খবর্দ্দার দেশের কথা ভাবিস না। তোদের মন হল জল, দেশের ভাবনা হল তেল,—তোদের মনে ও ভাবনা মিশ খাবে না। আজ হোক কাল হোক তোরা চুলোয় যাবিই, দেশের ভাবনা যারা ভাবতে পারবে তারা একদিন উদয় হবেই, হয়ত দু'একজন এরই মধ্যেই হয়েছে,—দেশের ভাবনাটা ভাববার বরাত তাদের হাতেই ছেড়ে দে। দেশের গায়ে বিষফোড়ার মত উঠছিস, স্বদেশীয়ানা মলম দিয়ে নিজেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করিস না, দোহাই তোর, পেকে উঠে ফেটে যা, দেশের একটু খারাপ পুঁজরক্ত বেরিয়ে যাক!'

ধরিতে গেলে বীরেশ্বরের এটা বক্তৃতা বৈ কি। কথাগুলিতে জ্বালা আছে, উত্তেজনা আছে, তবু সুরটা যেন তামাসার, মুখখানা বীরেশ্বরের শান্ত অথচ গম্ভীর। জীবনে শঙ্কর তাঁকে কোনদিন এ ভাবে এ ধরণের কথা বলিতে শোনে নাই। খানিকক্ষণ অভিভূতের মত সে বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে কেমন মনে হইতে লাগিল ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ, অপবিত্র।

'আমি একা তো বিষফোড়া নই?'

বীরেশ্বর যেন সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'তা হলে আর দেশের ভাবনা কি ছিল ভাই? দুটো একটা বিষফোড়ায় দেশের কি আসে যায়?'

শঙ্কর চুপ-চাপ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'বিষফোড়ার তো চিকিৎসা দরকার ? উচিত তো চিকিৎসা করা ?'

'ফোড়াটা যাতে শরীরে বসে যায়, সেই চিকিৎসা ? তার চেয়ে চিকিৎসা না হওয়াই ভাল। জানিস শঙ্কর, পাপীকে দিয়ে পুণ্য কাজ করাতে নেই,—তাতে পাপটাও জমে থাকে, পুণ্য কাজটাও নস্ট হয়।'

'কিন্তু সবাই যদি পাপী হয়, আর পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু করতে দেওয়া না হয়, তা হলে তো মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার !'

'পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু করতে দেওয়া না হত, মানুষের ভবিষ্যতে তা হলে ডে-লাইট জ্বলে উঠত।'—বীরেশ্বর হঠাৎ হাসিলেন, মৃদু ক্ষোভের হাসি। কথার মারপ্যাঁচের মজাটা তিনি জানেন, বাঁদরের মত মানুষকে নাচানর এমন কৌশল আর নাই, মানুষকে বাঁচানর এমন উপায়ও আর নাই। কিন্তু কেবল কথার মারপ্যাঁচে নয়, জোর করিয়া কেহ কিছু বলিলেই এই তেজস্বী নাতিটি তাঁর বিচলিত হইয়া দ্বিধা সন্দেহে দোল খাইতে আরম্ভ করে, এমনই সে মহাপুরুষ ! অথচ নিজের সম্বন্ধে কত বড় ধারণাই সে আত্মপ্রতারণার রসে দিনের পর দিন বাড়াইয়া আসিয়াছে ! আমিত্ববোধের বন্যায় কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে তার আমিত্ব !

দোতালার বারান্দায় বসিয়া বীরেশ্বর শঙ্করের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, নীচের তলায় যে ঘরে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিল, সেই ঘরের অঙ্গনে একটা খেঁকিকুকুর তাড়াতাড়ি কি যেন একটা অখাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতেছিল। কুকুরটার খাওয়া দেখিতে দেখিতে বীরেশ্বরের হাসির ক্ষোভটুকু মিলাইয়া গেল। শঙ্কর মুখ খুলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাকে সে সুযোগ না দিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'পাপের ক্ষয় হয় প্রায়শ্চিত্তে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি জানিস শঙ্কর? পাপ! পাপ করার চেয়ে বড় শাস্তি পাপীর আর কিছু আছে? এক যুগে হোক, একশ যুগে হোক, পাপ করে করে পাপীর পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। বিষফোড়া উঠে উঠে দেশের বিষও একদিন ক্ষয় হয়ে যায়।'

শঙ্কর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, 'আপনি মহাপাপী দাদু।'

'কিসে জানলি?'

'দেশের কথা নিয়ে কবিত্ব আর তামাসা করছেন।'

সীতা পিসীমাও বলেন, 'তুই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছিস শঙ্কর।'

নিজের কথাটাই আরও স্পষ্ট করিবার জন্য আবার বলেন, 'মুখখানা কি রকম শুকনো দেখাচ্ছে তোর।'

একটা ঢোক গিলিয়াই চোখ নামাইয়া লজ্জার সঙ্গে বলেন, 'তোর সঙ্গে এসব কথা বলা অবশ্য আমার উচিত নয়, তবু, না বলেই বা কি করি বল? তরঙ্গের জন্য মন খারাপ করিস না শঙ্কর। যে কীর্ত্তি করেছিল মেয়েটা, ও যে গেছে ভালই হয়েছে। আমি জানি, আমার কথা শোন, তরঙ্গের জন্য মন খারাপ করিস না।'

শঙ্কর একটু কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা মন খারাপ করব না। কিন্তু তরঙ্গ কি কীর্ত্তি করেছিল শুনি?'

'আমি তা বলতে পারব না বাপু।'

সীতা পিসীমার ভারি একটা মজার খেলা জুটিয়াছে। নানা ছলে একে একে সকলকেই তিনি জানাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, তরঙ্গের সম্বন্ধে তিনি একটা ভয়ঙ্কর কথা জানেন, কিন্তু কথাটা যে কি, তা তিনি বলতে পারবেন না বাপু। তরঙ্গের কথা ভাবিয়া মনটা হয়ত সীতা পিসীমার সত্যই খারাপ হইয়া যায়, চোখে জলও দেখা দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু কি করিবেন, এত বড় একটা নাটকীয় ব্যাপারকে ঠিকমত কাজে লাগাইতে না পারিলেই বা তাঁর চলিবে কেন? এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য তাঁর যে, তরঙ্গের একটা গভীর রহস্যময় গোপন কথা এ জগতে কেবল তিনিই জানেন, আর কেহ জানে না! ভাবিলেও সীতা পিসীমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।

তরঙ্গকে কড়িকাঠে বাঁধা দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়াও তাঁর সে রকম শিহরণ জাগে নাই!

শঙ্করের সঙ্গেই নানা ছুতায় তরঙ্গের কথা আলোচনা করিবার জন্য সীতা পিসীমার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। শঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাটাও যেন তাঁর স্মরণ থাকে না। 'মরে তরঙ্গ বেঁচেছে শঙ্কর। ছুড়ি যদি বেঁচে থাকত—' এই ধরণের আলাপ আরম্ভ করিয়া শঙ্করের মুখে বেদনার ছায়াপাত হইতে দেখিলে সীতা পিসীমার মন গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়।

শঙ্করের জন্য অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে মমতা করার এই উগ্র অনুভূতির স্বাদ তাঁকে পাইতে হয় বটে, কিন্তু কি করিবেন তিনি, জীবনের সাধারণ সহজ অনুভূতিতে সাধ যে তাঁর মেটে না, তৃপ্তি যে তিনি পান না।

শেষ পর্য্যন্ত সীতা পিসীমার হাত এড়াইবার জন্যই শঙ্কর পলাইয়া যায় কলিকাতায়।

একটা বড় সভায় শঙ্করের অবশ্য বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, যার জন্য একটা বক্তৃতার সুযোগ সে নষ্ট করিয়াছে, এবার যথাসময়ে কলিকাতায় সে চলিয়া আসিতই। কিন্তু বক্তৃতার কয়েকটা দিন দেরী ছিল। সীতা পিসীমা যে ভাবে তাকে মমতা করিয়া আনন্দ সংগ্রহ করিতেছিলেন, গ্রামের বঞ্চিত নরনারীকে তেমনি ভাবে মমতা করিয়া সেও তেমন আনন্দই অনুভব করিতেছিল। সীতা পিসীমা পিছনে না লাগিলে আরও কয়েকটা দিন গ্রামে সে থাকিত।

বক্তৃতা দিবার কায়দা সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, সুরে সুর মিলাইয়া উচু-নীচু গলায় সে চমৎকার বলিতে পারে। অনেক হাততালিও পায়! কয়েকবারের অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রোতাদের বালক কল্পনা করিয়া ভয় আর লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিলেই দেখা যায়, বলাটা অতি সহজ।

শঙ্কর চলিয়া যাওয়ার দুদিন পরেই হঠাৎ অনুপমের সঙ্গে সাধনা গ্রামে আসিয়া হাজির হইলেন। শঙ্করের মার মত

তাঁরও নাকি দেশে আসিবার জন্য মনটা কেমন করিতেছিল, সকলে দেশে আসিয়াছে শুনিয়া তাই দু'একটা দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছেন।

কিন্তু সাধনার ভাব দেখিয়া মনে হইল, দেশের জন্য তাঁর মন কেমন করে নাই, কয়েকদিন বীরেশ্বরের কাছে আসিয়া থাকিবার জন্যই মন কেমন করিয়াছিল। কলিকাতার বাড়ীতে শ্বশুরের কাছে থাকিবার তাঁর উপায় নাই, স্বর্গীয় স্বামীর নিষেধটা স্পষ্টভাবে অবহেলা করিতে সাধনার তেজস্বিতা আর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানে বাধে। তবে দেশের কথা আলাদা। দেশের বাড়ীর কথা স্বামী কিছু বলিয়া যান নাই, কিছুদিন আগে পুরানো কলহ-বিবাদের কথা ভুলিয়া নিজের বাড়ীতে গিয়া থাকিবার জন্য বীরেশ্বরের নিমন্ত্রণটা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার সঙ্গেও দেশের এই বাড়ীতে আসার কোন সামঞ্জস্য নাই।

'অনুকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি বাবা।'

অনুপমকে দেখিলেই বোঝা যায়, তার জন্য ভাবনায় পড়া তার মার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

বীরেশ্বর বলিলেন, 'আস্তে আস্তে হয়ত সব ঠিক হয়ে যাবে মা।'

'দিনরাত বসে বসে কি যেন ভাবে, আর নয় ত পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নাওয়া-খাওয়ার দিকে নজর নেই, রাতে ঘুমোয় কিনা সন্দেহ,—কি রকম চেহারা হয়েছে দেখেছেন তো?'

বীরেশ্বর নীরবে সায় দিলেন !

চাপা আর্ত্তনাদের সুরে সাধনা বলিলেন, 'পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো ?'

'পাগল বলেই তো এ রকম করছে।'

সাধনার সবটুকু আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষটা যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। সকাতর অনুনয়ের সুরে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আপনি কিছু করুন বাবা ওর জন্যে, আমি হার মেনেছি। আপনি ছাড়া কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। এত অশান্তি আমার আর সহ্য হয় না বাবা, তরঙ্গের মত আমিও শেষে গলায় দড়ি দিয়ে বসব।'

অনুপম এই বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে ঘরটিতে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঘরেই। দোতালার এই বারান্দা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গ্রামের কাঁচা ঘরবাড়ী দেখা যায়, মাঝে মাঝে দুটি একটি ছোট-বড় দালান। ঘরবাড়াগুলির অধিবাসীদের কারও মনে শান্তি আছে কিনা সন্দেহ, গ্রামের আবহাওয়াটি কিন্তু বড়ই শান্ত। শান্তিপূর্ণ শ্রীহীনতা চারিদিকে এমন ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে যে, অনভ্যস্তের রীতিমত অস্বস্তি বোধ হয়। আজ আবার কোথা হইতে একটা পচা গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছিল—বায়ু আজ হঠাৎ দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এতদিন বাতাস কেবল বদ্ধ ঘরের ভাপ্‌সা বাতাসের মত ছিল—এমন কটু পীড়াদায়ক গন্ধ বহিয়া আনে নাই।

বীরেশ্বর ম্লান মুখে বসিয়া বসিয়া ভাবেন। অনুপমকে

বুঝাইয়া শান্ত, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ করিবার ক্ষমতা কি তাঁর আছে? এ পাগলামি অনুপমের কোনদিন কমিবার নয়,—কেবল এখন বাড়াবাড়ি দেখা দিয়াছে, সেটুকু ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে, যদি আবার বাড়াবাড়ি করিবার নূতন কোন কারণ না ঘটে। কি বলিবেন তিনি অনুপমকে? নিজের জীবনের ইতিহাস বীরেশ্বরের টুকরা টুকরা মনে পড়িতে থাকে—অন্যভাবে তিনিও জীবনে অনেক পাগলামি করিয়াছেন। অসাধারণ অবস্থায় কখনও কখনও কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া পাগলামি তাঁর এমনি বাড়াবাড়িতেও পরিণত হইয়াছে অনেকবার,—অন্য সময় নানাভাবে নানা উপলক্ষে নানা বিষয়ে কমবেশী প্রকাশ পাইয়াছে। তবে রামলাল, শ্যামলাল, সীতা, শঙ্কর, অনুপম এদের মত এতখানি বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত তিনি ছিলেন না। তাঁর সময়ে পারিপার্শ্বিকতার যাঁতায় এমন ভীষণভাবে মানুষ নিষ্পেষিত হইত না, মানুষের জীবন এমন ভাবে গুঁড়া হইয়া যাইত না।

শঙ্কর ও অনুপমের ছেলেমেয়েরা না জানি কি রকম হইবে?

অনুপমের সঙ্গে কথা বলিয়া বীরেশ্বর দেখিলেন, তাকে কিছু বোঝানো অসম্ভব। সে এমন ধীর, স্থির ও অন্যমনস্ক যে, কোন কথাই এক রকম তার কানে যায় না।

তা ছাড়া সে ভয়ঙ্কর নির্লজ্জও হইয়া পড়িয়াছে।

'তরঙ্গ আমার সব দিক্ দিয়ে সর্ব্বনাশ করে গেছে দাদামশায়।'

কথা বলিবার সময় লজ্জায় অনুপম মাথা তুলিতে পারে না, কিন্তু বীরেশ্বরের মনে হয় এমন নির্লজ্জ মানুষ জীবনে তিনি আর দেখেন নাই।

তা হোক, ছেলে অনুপম ভাল—পড়াশোনায়। সাধনা যেমন মনে করিয়াছিলেন, আর অনুপম যেমন কল্পনা করিয়াছিল, সে রকম না হইলেও পরীক্ষার ফলটা তাহার ভালই হইয়াছে দেখা গেল। তরঙ্গের জন্য কিছুদিন সে যে রকম হইয়া গিয়াছিল, সে হিসাব ধরিলে এ একটা রীতিমত বাহাদুরী বলিতে হইবে বৈ কি।

শঙ্করের মার গাঁয়ে থাকার সখ মিটিয়া যাওয়ার পর সকলে আবার সহরে ফিরিয়া আসিলে, ছেলের পরীক্ষার ভাল ফল হওয়া উপলক্ষে সাধনা একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। বীরেশ্বরকে এক ফাঁকে বলিলেন, 'আপনার কথাই ঠিক হল বাবা, নিজে নিজেই আস্তে আস্তে বেশ সামলে উঠেছে।'

অনুপম সাধনার বিশেষ অনুরোধে বীরেশ্বরকে একটু ঘটা করিয়াই প্রণাম করিল। বীরেশ্বর মনে মনে কোন আশীর্বাদ করিলেন কিনা বোঝা গেল না, মুখে শুধু বলিলেন, 'ঠিকমত প্রণাম করতে কোথায় শিখলি রে শালা?'

সীতা পিসীমা কিন্তু অনুপমের শরীর ভাল হইয়াছে আর পাগলামি কমিয়াছে দেখিয়া যেন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন।

তাঁর কেবলই মনে হইতে লাগিল, অনুপম যেন ফাঁকি

দিয়াছে, তাঁকে ঠকাইয়াছে। ভারি একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে অনুপম। একেবারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তরঙ্গ না অনুপমকে অত বড় একটা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল? কয়েকমাসের মধ্যে এ ভাবে তরঙ্গকে অনুপম ভুলিয়া যায় কোন্ সাহসে? সংসারে কি ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বলিয়া কিছু নাই? সীতা পিসীমার বিশেষ কষ্ট হয় এই জন্য যে, তিনি যে-রকম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-রকম কিছুই ঘটিল না। অনুপম গোপনে ক্রমাগত অশ্রুপাত করিবে, সকালে দেখা যাইবে বালিশটা তার ভিজিয়া চপ্ চপ্ করিতেছে, প্রকাশ্যে থাকিয়া থাকিয়া অনুপমের চোখ ছল ছল করিবে, দিন দিন শুকাইতে শুকাইতে সে হইয়া যাইবে কাঠ, চালচলন ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া প্রতিনিয়ত মনে হইতে থাকিবে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই বুঝি সে গেরুয়া পরিয়া হইয়া গেল সন্ন্যাসী! তার বদলে এ কি খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা অনুপমের! কিছুদিন জ্বরে ভুগিয়া মানুষ যেমন ভাল হইয়া ওঠে, সে যেন তেমনই ভাবে ধীরে ধীরে গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে!

বাড়ীতে লোকজন আসায় অনুপমের সত্যই বেশ ভাল লাগিতেছিল। সকলের সঙ্গে সস্মিতমুখে সে কথাবার্ত্তা বলে, পাড়ার কয়েকটি বন্ধুশ্রেণীর ছেলের সঙ্গে হাসি-তামাসা করে, তাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া একপেট খায়, বিকেলের দিকে কারও অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই বাড়ীতে

ছোটখাট একটি গানের আসর বসায়। মনে হয় বাড়ীতে যেন উৎসবের আমেজ লাগিয়াছে।

সাধনার মুখে হাসি ফুটে। সীতা পিসীমার বুক ফাটিয়া যাইতে থাকে।

কেন এমন হইল? কেন অনুপম তাঁকে পাশে বসিয়া গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধরা গলায় বলিবার সুযোগ দিল না যে, তরঙ্গ অনেক করিয়া তাঁকেই দেখিতে বলিয়া গিয়াছে, অনুপম যেন ভয়ানক মুষড়াইয়া না যায়, খাপছাড়া কিছু না করে? হায়, তরঙ্গ যে নাটকীয় কাজের ভার তাঁকে দিয়া গিয়াছে, সেটা করিবার সুযোগ বুঝি অনুপম আর তাঁকে দিল না।

সন্ধ্যার সময় সাতা পিসীমার আর সহ্য হয় না! মানুষের পক্ষে প্রায় অব্যবহার্য্য অস্বাস্থ্যকর যে ঘুপচির মত ঘরটির মধ্যে তরঙ্গ সখ করিয়া বাস করিত, অনুপমকে সেইখানে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলেন, 'আর তো তোমায় না বলে থাকতে পারছি না অনু।'

'কি পিসীমা?'

পাড়ায় কোথায় শাঁখ বাজে, পর পর তিনবার।

'তরঙ্গ যা লিখে রেখে গিয়েছিল—চিঠির যেটুকু আমি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তাতে। তুই কতবার জানতে চেয়েছিলি, বলি নি,—বলতে পারি নি। আজ তোর মুখ দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে অনু।'

অনুপম বিবর্ণ হইয়া যায়। আবছা অন্ধকারে তার মুখের

ভাব-পরিবর্ত্তন যতটুকু চোখে পড়ে, তাতেই সীতা পিসীমার বুক দুড় দুড় করে।

অনুপম প্রশ্ন করিবে, এই প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। অনুপম কিন্তু চুপ করিয়া থাকে, তরঙ্গের চিঠির গোপন রহস্য জানিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না।

অগত্যা সীতা পিসীমা নিজেই বলেন, 'তরঙ্গ শঙ্করকে ভালবাসত।'

অনুপম তবু চুপ করিয়া থাকে।

'শঙ্করের জন্যই তো তোদের বাড়া ছেড়ে হঠাং ও বাড়ীতে চলে গেল।'

তরঙ্গের হৃদয়ের গোপন রহস্য ব্যক্ত করিলেন, কথাটা যে সত্য তার প্রমাণও দিলেন, তবু অপনুম একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিল না দেখিয়া সীতা পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ অনুপমকে ঠেলিয়া দিয়া তরঙ্গের সেই চোরাকুঠি হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিতে গিয়া পায়ে পা জড়াইয়া তিনি গেলেন পড়িয়া। গড়াইতে গড়াইতে অর্দ্ধেকটা সিঁড়ির বাঁকের মুখে রেলিংএ তিনি আটকাইয়া থাকিলেন।

সীতা পিসীমা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবেশী আর একটা বাড়ীতে শাঁখ বাজিল। পাড়ায় তিন চারটি বাড়ীতে আজও শাঁখ বাজাইয়া সন্ধ্যার বন্দনা হয়।

## অষ্টম অধ্যায়

"...যে চণ্ডীপাঠ করতে পারে সেও সাধারণ লোক, যে জুতা সেলাই করতে পারে সেও সাধারণ লোক, কিন্তু যে চণ্ডীপাঠও করতে পারে, জুতা সেলাইও করতে পারে, তার অসাধারণ প্রতিভায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। মোহ মানুষকে এইভাবে আক্রমণ করে। মানুষের মনে থাকে বিকার এবং চিরন্তন বা সাময়িক রীতিতে পরিচালিত জগতে আপাত-বিপরীতের সমন্বয় মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে। চণ্ডীপাঠ করতে জানে বলে কারও জুতা সেলাই করতে না জানার কোন কারণ নেই, তবু চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্য্যন্ত যে জানে, আমাদের কাছে সে মহাপুরুষ: মানুষকে দেবতা বলে পূজা করাটা আমাদের কাছে কঠিন নয়, মানুষকে পশু বলে ঘৃণা করাটা আরও সহজ, কিন্তু মানুষকে মুখে চণ্ডীপাঠ করে হাতে জুতা সেলাই করতে দেওয়া আমাদের কাছে সৃষ্টিছাড়া খাপছাড়া ব্যাপার।"

"এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার যে, এ বিষয়ে আমরা একটা চল্‌তি ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাষার ব্যবহার করি। আমরা ব্যঙ্গ-প্রিয় জাতি। আপনারা জানেন, সেই ব্যঙ্গই সবচেয়ে জোরালো হয়, যে ব্যঙ্গে আপাত-বিপরীতের সমন্বয়টা খুব স্পষ্ট—আকাশ বললে যখন পাতাল বোঝায়, তখন ব্যঙ্গটা ক্ষীরের মত জমাট বাঁধে।

ভিখারীকে রাজা বলার চেয়ে বড় ব্যঙ্গ আর কি আছে? একজন চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্য্যন্ত জানে বললে সোজাসুজি অর্থটা দাঁড়ায় এই যে, লোকটা জানে না এমন কাজ নেই, কিন্তু আমরা কি তাই বোঝাতে চাই? আমরা বোঝাতে চাই যে, লোকটা কিস্‌সু জানে না! এখন স্কুলে কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাই, তাও অনেকটা চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই করতে শেখার মত, অথচ আশ্চর্য্য এই—"

শ্রোতারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে না, প্রাণপণে হাততালি দেয়! কলেজের প্রকাণ্ড হলটা হাততালির আওয়াজে গমগম করিতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে যাদের স্নায়ু একটু বেশী দুর্ব্বল, তারা রোমাঞ্চও অনুভব করে। তাদের কলেজের একজন এক্‌স্‌-ষ্টুডেণ্ট এমন সুন্দর ভাবিতে পারে ভাবিয়া কতকগুলি তরুণ বক্ষই যে ব্যথিত গৌরবে ভরিয়া যায়!

কিন্তু হাততালিতে অনুপমের যেন চমক্ ভাঙে। কলেজে পুরাতন ছাত্রদের বাৎসরিক মিলনোৎসবে যোগ দিবার কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না, দুটি উৎসাহী ছেলের টানাটানিতে আসিয়াছে। কলেজের ছেলেদেরই কবিতা পাঠ, ক্যারিকেচার, মাসল্ কণ্ট্রোল ইত্যাদি দিয়া যে মিলন-সভায় নিমন্ত্রিতদের 'এন্টারটেন' করা হইয়াছে, সেই সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবারও কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না, সেই উৎসাহী ছেলে দুটির ঠেলা-ঠেলিতেই 'কিছু' বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীপাঠ আর জুতা সেলাই করা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা তার ছিল না,

স্কুল-কলেজের শিক্ষার সমালোচনা করার কথাও সে ভাবে নাই। ও সব বলাও রীতি নয়,—কলেজ-জীবনের স্মৃতি সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না, আজ এই মিলনোৎসবে যোগ দিতে পারিয়া গভীর আনন্দে মুখে তার ভাল করিয়া কথা সরিতেছে না,—জড়াইয়া জড়াইয়া এই ধরণের কিছু বলিলে শোনাইতও ভাল, নিয়ম রক্ষাও হইত।

তার বদলে এসব সে কি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে? আবোল-তাবোল কথাগুলি শুনিয়া ছেলেরাই বা এত খুসী হইল কেন? অভিযোগের ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু বলিলেই বোধ হয় ছেলেদের ভাল লাগে—খেইহারা রসাল নিন্দা আর সমালোচনা!

কথাটা অনুপমের অসম্ভব মনে হয় না। যে ধরণের গান, কবিতা পাঠ, ক্যারিকেচার আর মাসল্ কণ্ট্রোল সকলের হাততালি আদায় করিয়াছে!

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর ও নিমন্ত্রিত বয়স্ক ভদ্র-লোকেরা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়াও অনুপম কিন্তু থামে না, বেশ করিয়া কলেজের শিক্ষা আর কলেজে শিক্ষিত ছেলেদের একচোট গালাগালি দেয়। শুনিয়া ছেলেদের সে কি উল্লাস! একপাশে জন ত্রিশেক মেয়ে বসিয়াছিল, তাদের মধ্যেও অনেকের চোখদুটি উত্তেজনায় ছল ছল করিতে থাকে, আনন্দের আতিশয্যে ঠোঁট চাপিয়া হাসিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কারও কারও অসমান নোংরা দাঁতগুলিও আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে।

সেই হইল সূত্রপাত। পরদিন দুটি সমিতি অনুপমকে সদস্য করিয়া লইল। একটি সমিতির নাম 'দি ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেক্শন অব এভরিবডিজ রাইট্স ইনক্লুডিং ষ্টুডেন্টস,' অপরটির নাম 'শিক্ষা সমাজ ও সাহিত্য সংস্কার সমিতি'। প্রথমটির প্রেসিডেন্ট একজন অল্পবয়সী অধ্যাপক, অন্ততঃ চেহারা দেখিলে মনে হয়, বয়স ভদ্রলোকের বেশী নয়। একটা বিলাতী উপাধি আছে, কিন্তু সবজান্তার নিবিড় বিনয়ে সর্বদা টইটম্বুর হইয়া থাকেন। ছাত্র এবং ছাত্রীদের বড় ভালবাসেন, তাদের সমস্ত সভা-সমিতি উৎসব-অনুষ্ঠানে হাজিরও থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ সভা-সমিতি উৎসব-অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তনের সময় ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য ছুটিয়া আসে।

জন দুই ভক্ত ও সমিতির সদস্য এবং ছাপান প্যাম্ফলেট, কার্ড ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া নিজেই তিনি অনুপমকে আক্রমণ করিতে তাঁর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হন। অমায়িক হাসি হাসিয়া বলেন, 'আমি দি ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেক্শন অব এভরিবডিজ রাইট্স ইনক্লুডিং ষ্টুডেন্টস-এর প্রেসিডেন্ট সরসীলাল ভাদুড়ী।'

শুনিলে মনে হয় তাঁর জগদ্বিখ্যাত নামটি যদি এ পর্যন্ত অনুপমের কানে না পৌঁছিয়া থাকে, অনুপম যে জগতে সবচেয়ে অপদার্থ লোক, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

বসিতে বলিয়া ভদ্রতা করার উপায় ছিল না, কারণ ভদ্রলোক আগেই বসিয়াছিলেন। অনুপম তাই বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমাদের এসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে !'

'বেশ।'

দ্বিতীয় সমিতিটির সম্পাদক একটি ছাত্র। নাম ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্ত্তী, বয়স বছর চব্বিশ, চেহারা আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর। সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু ক্রোধটা যে কাহার বা কিসের উপর নিজেও ভাল বোঝে না, অপরকেও বুঝাইতে পারে না। বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেই ক্রুদ্ধ মুখখানি তাহার ক্রোধে একেবারে টকটকে লাল হইয়া যায়।

'আপনারাও যদি আমাদের সমিতিতে যোগ না দেন, যদি দশ জনের মত কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাটাই জীবনে একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করেন—'

অনুপম বলে, 'আমি কি বলেছি যোগ দেব না ?'

কিন্তু এত সহজে ব্রহ্মানন্দের ক্রোধের উপশম হয় না। সহজে কেন, কিছুতেই হয় না।

'আপনি না বলতে পারেন, আপনার মত অনেকেই বলে। লেখাপড়া শিখে কোন রকমে একটা চাকরী বাগিয়ে বিয়ে-টিয়ে করে ঘর-সংসার করাটাই যেন মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য !'

'আপনি বিয়ে করেছেন ?'

'আমি ? আমি বিয়ে করব !'

ব্রহ্মানন্দের মুখ দিয়ে কথা সরে না।

এই ভাবে অনুপমের জীবনের গতিও শঙ্করের জীবনের গতির

সঙ্গে একাভিমুখী হইয়া গেল। শঙ্কর যাত্রা আরম্ভ করিল একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে,—স্বেচ্ছায়। অনুপম যাত্রা আরম্ভ করিল সরু গলিতে—পরের ইচ্ছায়। শঙ্করকে ভিড়ের মধ্যে নিজের পথ করিয়া লইতে হইল ধাপ্পাবাজীর জোরে,—অনুপমকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল একদল ছেলেমানুষের নির্ব্বোধ উচ্ছ্বাস।

কিন্তু দেখা গেল, অনুপমের পশার জমিতেছে তাড়াতাড়ি, শঙ্কর যেখানে আর দশজন মহাপুরুষের সঙ্গে বিচরণ করিবার অধিকার লাভের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, বিনা চেষ্টায় অনুপমও আগাইয়া চলিয়াছে সেইখানেই। ছেলেরা অনুপমকে পছন্দ করে, ছাত্রছাত্রীমহলে তার নাম ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে কোন অনুষ্ঠানই হোক, ছেলেরা তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। কিছু বলিতে হয় অনুপমকে। কি যে সে বলে ভাল বোঝা যায় না, কারণ, মনে যা আসে তাই সে বলিয়া যায়। কিন্তু স্কুলে মাষ্টার আর কলেজে প্রফেসরদের ব্যাখ্যামূলক লেকচার শুনিতে অভ্যস্ত ছেলেদের কাছে তার ঈষৎ ভয়ে ভয়ে আবোল-তাবোল কথা বলাটাই মনোহর লাগে। অনুপমের দাঁড়ানোর ভঙ্গী, কথা বলার সময় মুখ ছাড়া হাত প্রভৃতি শরীরের বাড়তি অঙ্গগুলি লইয়া অস্বস্তি বোধ করিবার ভঙ্গী, মাঝে মাঝে নাকের ডগা চুলকান, এ সব দেখিয়া ছেলেদের একটা গভীর মমত্ববোধ জাগে। অনুপমকে মনে হয় ঘরের লোক। ছাত্রীরা সাধারণতঃ মুচকি মুচকি হাসে, তবে কারও কারও মধ্যে বাৎসল্যের সঞ্চারও হয়।

অন্ততঃ আশালতার যে হয় তাতে সন্দেহ নাই।

পছন্দসই ছেলে দেখিলে একদিন, খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, তার শুধু প্রেমেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু একবার শুধু একটু অসাবধানতার জন্য, তাও বড় বেশী দিনের কথা নয়, মাতৃত্বের পথে মাস তিনেক আগাইবার সুযোগ পাওয়ার পর, বাৎসল্য ভিন্ন আর কিছুই সে অনুভব করিতে পারে না।

নিজে যাচিয়া সে অনুপমের সঙ্গে পরিচয় করিল।

'আপনাকে দেখিলেই বোঝা যায় আপনার মধ্যে এমন কিছু আছে, আজকাল মানুষের মধ্যে যা খুঁজেই পাওয়া যায় না। সরলতা, তেজ, আদর্শে অনুরাগ, ন্যাচুরেল পোইজ—'

মনে হয়, যেন অনুপমের পিঠ চাপড়াইয়া দিবে!

'একদিন আসবেন আমাদের বাড়ী? আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতাম।'

'নিশ্চয় যাব।'

'আজকেই চলুন না? এখনও আটটা বাজেনি।'

অনুপম মুখে বিষাদের ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'আজ? আজ আমায় মাপ করতে হবে। বাড়ীতে মার শরীর ভাল নয়—'

আশালতা দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'মার শরীর খারাপ? যান যান শীগগির বাড়ী যান। আমিও রইলাম, আপনিও রইলেন, একদিন গেলেই হবে'খন আমাদের বাড়ী। মাকে ফেলে কি করে যে এলেন!'

সাধারণ জ্বর হইয়াছিল। সামান্য জ্বর। দুপুরে একবার

শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিকালে আবার উঠিয়াছেন। অন্যদিন অনুপম কিছুই বলিত না, আজ সদ্য সদ্য আশালতার ব্যাকুলতা কানে বাজিতেছিল কি না, তাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'জ্বর গায়ে উঠেছ যে ?'

'ঘরের কাজ করবে কে ?'

'ঝি আসে নি ?'

'ঝি রাঁধবে নাকি ?'

'বললাম একটা ঠাকুর রাখ—'

'নবাবের মত কথা বলিস না অনু।'

বোঝা গেল জ্বর যত না হোক, সাধনার রাগ হইয়াছে অনেক বেশী। রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল, নিজের জন্য সাধনা বার্লি জ্বাল দিতেছিলেন।

অনুপম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, 'নিমিকে কয়েকদিনের জন্য এনে রাখলে হত না ?'

সাধনা বলিলেন, 'তুই কি ভাবিস বল্ তো ? এখানে এনে রাখবার জন্য আমি নিমির বিয়ে দিয়েছিলাম, না ?'

এ কথার কোন জবাব নাই, কারণ কথাটার পিছনে আরও অনেক কথা আছে। সাধনার বার্লি জ্বাল দেওয়া হইয়া গেলে অনুপম নিজেই একটা আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

ভাত বাড়িয়া দিয়া সাধনা বলিলেন, 'আজ কত বছর বাইরে থেকে একটি পয়সা ঘরে আসে নি, কখনও ভেবে দেখেছিস অনু ? উনি টাকার গাছ পুঁতে রেখে যান নি।'

অনুপম নীরবে খাইয়া যায়।

'এ ভাবে নষ্ট করবার মত সময় কি তোর আছে অনু? শঙ্করের সাজে, তার ঠাকুর্দ্দা বড়লোক, তোর সাজে না। আরও পড়তে চাস পড়, ভবিষ্যতে যাতে উন্নতি হয় এমন কিছু করতে চাস্ কর, আমি যে ভাবেই হোক চালিয়ে যাব। একটা মাষ্টারী খালি আছে, তাই না হয় করব ক'বছর। কিন্তু তুই যদি এরকম উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াস্—'

সাধনা ঢোক গিলিয়া বলেন, 'হাত গুটোস নে, খা। জ্বর গায়ে বেঁধেছি, না খেয়ে উঠলে ভাল হবে না বলে রাখছি।'

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া অনুপম অন্ততঃ হাজার বার নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। পরদিন বিকালে সে যে ভাল জামা-কাপড় পরিয়া আশালতার বাড়ীতে গেল, সেটা ঠিক উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়ানর পর্য্যায়ে পড়ে না। আশালতার বাড়ীতে যাওয়াও তো একটা উদ্দেশ্য।

'আজ আপনি আসবেন ভাবতেও পারি নি।'

আশালতা যেন একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এ রকম ব্যাকুল ভাবে তার কাছে যারা ছুটিয়া আসে, তাদের কাছে আশা করার যে কিছু নাই, অনেক অভিজ্ঞতায় আশালতার এইটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে। বাঁধা পড়িবার মত ভদ্রতাজ্ঞান যাদের থাকে, একদিন সভায় কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইলে পরদিনই তার বাড়ী গিয়া হাজির না হইবার মত ভদ্রতাজ্ঞানও তাদের থাকে। চোর-ডাকাত

ছাড়া সুযোগ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ সুযোগ গ্রহণ করার প্রতিভা সরল, আদর্শে অনুরাগী, ন্যাচুরেল পোইজ্‌-বিশিষ্ট মানুষ কোথায় পাইবে ?

তবু, আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি আশালতা করিল না। বাড়ী-খানা ছোট। ছোট বসিবার ঘরখানাতে মোটামুটি একটু আধুনিকতা আমদানী করিতে গৃহকর্ত্তার যে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। কারণ পুরাতন সোফাটিতে বসিলে জানালার ফাঁক দিয়া অন্দরের যেটুকু অংশ চোখে পড়ে, সেখানে বাড়ীর লোকের আর্থিক অবস্থা ঢাকিবার কোন প্রচেষ্টাই নাই।

জানালার ফাঁকটুকু কে যেন এক ফাঁকে বন্ধ করিয়া দিল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের এ সব ফাঁকি অনুপমের জানা আছে, সে বিচলিত হয় না। সারা বছর যে বাড়ীর মেয়েরা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাসন মাজে, ঘর লেপে আর রান্না করে এবং অবসর সময়ে পরস্পরের চুলের অরণ্য হইতে উকুন বাছিয়া নখ দিয়া টিপিয়া টিপিয়া মারে, সেই বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুর দেখিতে যাওয়ার সময় অতি জমকালো সাড়ী অতি জমকালো ভাবে পরিয়াছে দেখিলে যেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না, গরীবের বাড়ীতে বাহিরের ঘরের এই সস্তা বড়লোকত্বের ভাবও তেমনই অনুপমের খাপছাড়া ঠেকে না। ইহাই নিয়ম, ইহাই প্রথা।

'আপনার মা কেমন আছেন ?'

'মা ? মা ভাল আছেন।'

অনুপম একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মুখখানা বড় গম্ভীর আশালতার।

তার সঙ্গে পরিচয় একদিনের, তার মাকে এখনও সে চোখে দেখে নাই। তার মার জন্য আশালতার এই আশ্চর্য্য দুর্ভাবনার কারণটা অনুপম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু আশালতার মুখের গাম্ভীর্য্য ক্ষণস্থায়ী। অন্যমনে বিষাদের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্বাসটা টানিবার সময়েই সে অপূর্ব্ব কৌশলে হাসিয়া ফেলে, 'একটা কথা ভাবছিলাম।'

তারপর প্রতি সপ্তাহে এক এক ধাপ করিয়া আশালতার সঙ্গে অনুপমের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে থাকে, ধাপগুলি অনুপমের অপরিচিত। কিসের সিঁড়ি বাহিয়া কোথায় উঠিতেছে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সেইজন্যই উঠিতে যেন আরও মজা লাগে।

আশালতা তার সঙ্গে আলাপ করে নানা বিষয়ে,—সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, কিছুই বাদ যায় না। এই সব আলোচনায় ফাঁকে ফাঁকে একটি দুটি করিয়া সে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে।

'এবার কি করবেন ভাবছেন ?'

অনুপম ভাসা ভাসা ভাবে জবাব দেয়, 'কি আর করব, চাকরী-বাকরী খুঁজছি।' শুনিয়া আশালতা খুসী হইতে পারে না।

'আরও পড়ুন না ? এখন চাকরী করলে তো কেরাণীগিরি

না হয় মাষ্টারী। বরাবর ভাল রেজাল্ট করে আসছেন, ফিউচারটা নষ্ট করবেন না।'

আরও সপ্তাহখানেক অনুপম আসল অবস্থাটা গোপন করিয়া রাখে, তারপর কেন যে সব কথা খুলিয়া বলিয়া ফেলে, নিজেই বুঝিতে পারে না।

আশালতা গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ ভাবে। ভাবিতে ভাবিতেই অনুপমের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া চাহিয়া দেখে এবং একটি বিস্কুট নিজের হাতে তার মুখে তুলিয়া দেয়।

'আপনার ঠাকুর্দ্দা আপনাদের ত্যাগ করেন নি, আপনার বাবাই আপনার ঠাকুর্দ্দাকে ত্যাগ করেছিলেন, না?'

অনুপম নীরবে সায় দিয়া যায়।

'আপনার ঠাকুর্দ্দা এখন আর আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন না? সাহায্য করতে চান না?'

'চাইলে কি হবে? মা রাজী নন।'

আশালতা নিজের হাতে আর একখানা বিস্কুট অনুপমের মুখে তুলিয়া দেয়।

'আপনি যদি আপনার ঠাকুর্দ্দার কাছে গিয়ে পড়ার জন্যে টাকা চান, দেবেন না?'

'দেবেন, কিন্তু—'

'এমনি যদি টাকা চান, দেবেন না?'

'দেবেন, কিন্তু—'

'আপনি যদি গিয়ে বলেন, ঠাকুর্দ্দা, আমি বিলেত যাব আমায়

হাজার দশেক টাকা দিন, একসঙ্গে নয়, দশ মাসে পাঁচ সাত শো করে দিন,—তিনি দেবেন?'

'দেবেন, কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'মা জানতে পারলে আমার মুখ দেখবেন না।'

আশালতা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'মা কখনও ছেলের মুখ না দেখে থাকতে পারে? আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।'

অনুপম ঘাড় উঁচু করিয়া বলে, 'মার মনে আমি কষ্ট দিতে পারব না। তা ছাড়া বাবা মরবার সময় যা বলে গেছেন, তারও তো একটা দাম আছে? আমি বরং সারাজীবন কেরাণীগিরি করব, তবু ঠাকুর্দ্দার টাকা নিয়ে —'

আশালতা শান্তভাবে বলে, 'ছি, তাই কি আপনি পারেন? আপনাকে চিনি না আমি? মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে জীবনে বড় হওয়ার চেয়ে কেরাণীগিরি অনেক ভাল।'

অনুপমের মুখে একটা কালমেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল, সে মেঘ কাটিয়া যায়। পকেটে রুমাল খুঁজিতে খুঁজিতে আশালতা নিজের আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া চকিতে বাড়ী চলিয়া যাওয়ায় নিজেকে সে কৃতার্থও মনে করে।

সপ্তাহ দুই পরে একদিন ছাত্র-সমাজের এক সাধারণ সভায় আশালতার সঙ্গে হাজির হইয়া সে দেখিতে পায়, বক্তৃতামঞ্চে ছোট-বড় চেনা-অচেনা নেতাদের মধ্যে শঙ্করও বসিয়া আছে।

ছাত্র-সভা হইলেও ধরিতে গেলে এটা প্রকাশ্য জনসভা। এখানে কিছু বলিবার সাহসও অনুপমের ছিল না, সাধও ছিল না। ব্রহ্মানন্দের পাল্লায় পড়িয়া তাকে কিছু বলিতে হইল। ব্রহ্মানন্দ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া দিল যে, আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষা-সমাজ-সাহিত্য সংস্কার সমিতির মতামত সুবিখ্যাত ছাত্র-নেতা শ্রীযুক্ত অনুপম বাবু সভায় ব্যাখ্যা করিবেন। ঘোষণা করিয়া আরক্ত মুখখানা অনুপমের মুখের কাছে আনিয়া চাপা গলায় সে বলিল, 'আপনার পদবীটা ভুলে গেছি।—বসে রইলেন যে ? উঠুন, বলুন কিছু ?'

অনুপম ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলিল, 'আপনি সমিতির প্রেসিডেন্ট, আপনিই বলুন না ?'

ব্রহ্মানন্দ ক্রোধে আরও লাল হইয়া বলিল, 'আমি বলতে পারলে কি আপনাকে বলতে বলতাম ? শীগগির উঠুন।'

বলাটা ভাল হইল না অনুপমের। নিজের ভাঙ্গা থামা থামা কথা শুনিতে শুনিতে নিজের কান দুইটি তাহার গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। দু'একবার মনে হইল সভার ভিতর হইতে যেন দুই চারটা টিটকারীও কানে আসিয়া বাজিতেছে। শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য আর আদর্শ সম্বন্ধে যা মনে পড়িল, কয়েক মিনিটের মধ্যে কোন রকমে তাই অতি দুর্ব্বোধ্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সে থামিয়া গেল।

বসিতে গিয়া দেখিল, আশালতার পাশে তার আসনটি ব্রহ্মানন্দ বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। কি যেন সে বলিতেছে আশালতাকে,

আশালতা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া আছে। খানিক তফাতে বসিয়া অনুপম বিবর্ণ মুখে দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল। রাগে দুঃখে অভিমানে তার মনে হইতে লাগিল, যে কোন উপায়েই হোক তরঙ্গ আজ মহাশূন্যের যেখানে অদৃশ্য হইয়া মিশিয়া আছে সটান সেইখানে চলিয়া যায়।

অনুপমের মুখ দেখিয়া আশালতা ব্রহ্মানন্দের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়া আরও খানিকটা নিবিড়ভাবে আলাপ জুড়িয়া দিল।

অনুপম উঠিয়া চলিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় বক্তৃতা দিতে উঠিল শঙ্কর। কি চমৎকার বক্তৃতাই যে শঙ্কর দিল! কি হাততালিটাই থাকিয়া থাকিয়া সভায় উঠিতে লাগিল!

উঠুক, আশালতা অনুপমকে আগেই মারিয়া ফেলিয়াছে, এগুলি শুধু খাঁড়ার ঘা। তবু, মরা মানুষও যে খাঁড়ার ঘায়ে এত কষ্ট পাইতে পারে, তা কি অনুপম জানিত! তাদের বাড়ীতে চিলেকোঠার ঘরে সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছা অন্ধকারে সীতা-পিসীমা তরঙ্গ ও শঙ্করের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, অনুপমের মনে পড়িয়া যায়। সেই শঙ্কর এমন চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে? তাও আবার সেই সভায়, যেখানে খানিক আগে অতি সাধারণ কয়েকটা কথা বলিতে গিয়া সে লোক হাসাইয়াছে! অনুপমের মনে হয়, এত ভাল করিয়া বলা যেন তাকে অপদস্থ করার জন্য শঙ্করের ইচ্ছাকৃত বাহাদুরী।

সভা ভাঙ্গিলে আশালতা অনুপমকে বলিল, 'চলুন, আমরা যাই।'

ব্রহ্মানন্দ বলিল, 'বাড়ী যাবেন তো? চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।'

আশালতা শুষ্কস্বরে বলিল, 'কিছু মনে করবেন না ব্রহ্মানন্দ বাবু, আমাদের একবার মার্কেটে যেতে হবে।'

ব্রহ্মানন্দ বলিল, 'আমিও তো মার্কেটে যাব।'

আশালতা বলিল, 'আমরা একজনদের বাড়ী হয়ে যাব—আপনার সঙ্গে যেতে পারছি না।'

কারও বাড়ী নয় মার্কেট নয়—মাঠ। ব্রহ্মানন্দকে প্রত্যাখ্যান করার মৃত-সঞ্জীবনীতেও অনুপমের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইতেছে না দেখিয়া আশালতা বলিল, 'এস, একটু বসি।'

একটা গাছের নীচে আবছা অন্ধকারে অনুপমের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সে বলিল, 'তুমি বড্ড ছেলেমানুষ।'

সুতরাং দিন দশেক পরে আশালতার সঙ্গে অনুপমের বিবাহ হইয়া গেল।

অনুপম কিছুদিন অপেক্ষা করার কথা বলিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'একটা চাকরী-বাকরী ঠিক করে নিই আগে?'

আশালতা বলিয়াছিল, 'হবে, হবে, সব হবে।'

কি যে হইবে জানিলে হয়ত অনুপম ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু বিপদটা ঠেকাইতে পারিত কি না সন্দেহ।

## নবম অধ্যায়

কিছুদিন সাধনার মনের মত হইবার চেষ্টা করিয়া আশালতা দেখিল, কাজটা বড় কঠিন। সাধনার কাছে ফাঁকি চলে না। মানুষটা সহজ, শান্ত ও মমতাময়ী বটে, কিন্তু গোঁজামিলের ব্যাপারে বড় কড়া। খারাপ লোককে খারাপ লোক হিসাবে যদি বা খানিক কাছে ঘেঁষিতে দেন, ভালমানুষ সাজিয়া আপন হইবার চেষ্টা করিলে খারাপ লোক তাঁর কাছে একেবারেই প্রশ্রয় পায় না।

মানুষ বশ করিবার যত উপায় জানা ছিল, তার সবগুলিই আশালতা খাটাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল। কিন্তু দেখা গেল, ফলটা আরও খারাপ হইয়াছে। কোন চেষ্টা না করিলেই বরং ভাল হইত; সাধনার মনের মত হইতে গিয়াই সাধনার কাছে নিজের পরিচয়টা আরও বেশী পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

নিজের বোকামিতে আশালতা ক্ষুব্ধ হয়, রাগও করে। রাগটা হয় তার সাধনার উপর। তার প্রত্যেকটি চালাকি ধরিয়া ফেলিবার মত চালাক মানুষ যদি সাধনা হন, এ রকম সাদাসিধে সাধারণ ভালমানুষ সাজিয়া থাকিয়া তার মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া কি সাধনার উচিত হইয়াছে? সে হইল পুত্রবধূ, একমাত্র ছেলের একমাত্র বৌ, তাকে এ ভাবে ঠকান কি ভাল?

তাকে বিবাহ করার জন্যে সাধনার কাছে অনুপম ছেলে-

মানুষের মত অপরাধী সাজিয়া থাকে দেখিয়াও আশালতার গা জ্বলিয়া যায়। কেন, তাকে বিবাহ করার জন্য সে কি অনুপমের পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল? তার বয়স একটু বেশী, চালচলন সাধনার মনের মত নয়, কিন্তু সেজন্য দায়ী কি সে? নিজে দেখিয়া, নিজে পছন্দ করিয়া, নিজে ভালবাসিয়া নিজে প্রস্তাব করিয়া অনুপম তাকে বিবাহ করে নাই?

তা ছাড়া, ধরিতে গেলে সেই তো অনুপমকে অনুগ্রহ করিয়াছে। যেমন অবস্থা বাড়ীর, তেমনই অবস্থা অনুপমের নিজের, জানিয়া শুনিয়া সে যে অনুপমকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল, এটাই কি তার অসাধারণ মহত্বের পরিচয় নয়, তার বৃহৎ আত্মত্যাগের পরিচয় নয়, তার অপার্থিব, উদার প্রেমের পরিচয় নয়,—যে প্রেম মানবীকে দেবীতে পরিণত করে?

কিন্তু যতই রাগ হোক, যতই গা জ্বালা করুক, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মত বোকা আশালতা নয়। সাধনাকে জয় করিবার চেষ্টা সে ছাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু কোন রকম বিরোধ সৃষ্টি করে না। ছেলের কীর্ত্তিতে মর্ম্মাহত সাধনার সমস্ত উপেক্ষা ও অবহেলা নীরবে সহ্য করিয়া যায়, মনের গোপন কোণে বিদ্বেষ জমাইয়া রাখে।

সাধনার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকৃতির দর্পণে নিজের হীনতা ও সঙ্কীর্ণতা আশালতা বার বার প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিতে পায়, কিন্তু সেজন্য সে বিশেষ বিচলিত হয় না। তার সর্ব্বাপেক্ষা জ্বালা বোধ হয়, দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ, অতি সামান্য ঘটনায়

অনুপমের জন্য সাধনার অগাধ বাৎসল্যের অতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ অভিব্যঞ্জনা সে যখন অনুভব করিতে পারে।

মা ছেলেকে ভালবাসিবে, এই সহজ সত্যটির বিরুদ্ধে আশালতার নালিশ নাই, অনুপমের জন্য সাধনার স্নেহ যখন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়, তখন আশালতার কষ্টও হয় না, সাধনাকে শত্রু বলিয়া মনেও হয় না। কিন্তু সাধনার বাৎসল্যের সেই অভিব্যক্তিগুলি আশালতাকে একটা অদ্ভুত ও দুর্ব্বোধ্য যন্ত্রণা দেয় যে অভিব্যক্তিগুলি একমাত্র বাৎসল্যের অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কোন দৃষ্টিতেই ধরা পড়িবার নয়। তখন সাধনাকে আশালতার মনে হয় শত্রু, মনে হয় সাধনা যেন তার ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাকে বঞ্চিত করিয়া তার সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদটি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিজের মনের এই ব্যাপারটা আশালতা ভাল বুঝিতে পারে না। সে জানে, তার কাছ হইতে অনুপমকে কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা সাধনার নাই, সাধনাকে অনুপম যতই ভয় করুক, সাধনার মনে কষ্ট দিতে অনুপমের যতই আপত্তি থাক, মনের জোর অনুপমের নাই, সাধনার চেয়ে তাই অনুপমের উপর তার জোর অনেক বেশী। বৌ ছেলেকে পর করিয়া ফেলিবে, শাশুড়ীর এই আশঙ্কা যেমন বোঝা যায়, স্বামীর উপর শাশুড়ীর কর্তৃত্ব বেশী বলিয়া বৌ-এর হিংসাটাও তেমনই বোঝা যায়, কিন্তু স্বামীর জন্য শাশুড়ীর স্বাভাবিক বাৎসল্য বৌ-এর মনে আগুন ধরাইয়া দেয় কোন্ যুক্তিতে?

বিশেষতঃ বৌ যখন জানে, যে দিন খুসী স্বামীকে দিয়া সে এই বাৎসল্যের অপমান করাইতে পারে?

নিজের মনের এই দুর্বোধ্য রহস্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যে কয়েকটা দিন আশালতা নিজের মধ্যেই রহস্যের একটা সমীচীন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে, সেই কয়েকদিন তাহার চাল-চলনে একটা অপরূপ স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সঞ্চার হয়, যাহা সাধনাকে করিয়া দেয় অবাক্ এবং অনুপমকে করিয়া দেয় আরও বেশী মোহাতুর।

কিছুদিনের জন্য আশালতা যেন নতুন মানুষ হইয়া যায়। অনুপমের মনে হয়, ক্রমাগত তাকেই গ্রহণ করিয়া চলিবার প্রক্রিয়াটা বন্ধ করিয়া আশালতা যেন এতদিনে নিজেকে দান করিতে শিখিয়াছে, কেবল তাকেই আদর না করিয়া তার কাছ হইতেও আদর পাওয়ার প্রয়োজনটা একটু বুঝিতে পারিয়াছে।

একটু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি সামান্য।

কিন্তু অনুপমের কাছে তাই যথেষ্ট। আশালতা তার মধ্যে যে মোহ জাগাইয়া দিয়াছিল, আশালতার কাছে সে তার তৃপ্তি পায় না, গভীর অতৃপ্তিতে দিন দিন তাহার মোহ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে। আশালতা তাকে স্নেহ করে, সেবা করে, আদর করে, মাঝে মাঝে গভীর ও আন্তরিক আবেগে তাকে অভিভূত করিয়া দেয়, হাসিমুখে তার সমস্ত দাবী মিটাইয়া চলে,—তবু অনুপমের মনে হয়, কিছুই যেন আশালতা তাকে দিতেছে না, সব দিক্ দিয়া তাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছে।

কি সে চায় আশালতার কাছে ও কি সে পায় না, কেন একটা মর্ম্মান্তিক অতৃপ্তির যন্ত্রণা ধারাল অস্ত্রের মত মনকে তাহার ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়, অনুপম তাহা বুঝিতে পারে না। সময় সময় তার মনে হয়, আশালতা যেন ঠিক তার বৌ নয়, বৌ-এর মুখোস পরিয়া অন্য একটা সম্পর্ক পাতিবার জন্য আশালতা তার শয্যাপার্শ্বে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। এজগতে মানুষের যত আত্মীয়া থাকা সম্ভব, মা-বোন-মাসী-পিসী, আশালতা যেন তাই, তার উপরে সে বান্ধবী, তারও উপরে সে নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ একটা মাংসপিণ্ড। আর কিছুই নয়!

গভীর রাত্রি। সহরের আওয়াজ মৃদু হইয়া আসিবার স্তব্ধতা।

আশালতার অতি কোমল, অতি মৃদু মিনতির আজ্ঞায় ঘুম আসিবে না জানিয়াও অনুপম আশালতার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছে। বেশী রাত জাগিলে মানুষের শরীর খারাপ হয়।

আশালতা কথা বলে, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করে, নিবিড় মমতায় স্তিমিত চোখে মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু ও অপূর্ব্ব হাসি হাসে। অনুপমও কথা বলে, এক হাতের আঙুল দিয়া অপর হাতের আঙুলগুলিকে বন্দী করিয়া দুটি হাতকেই বুকের কাছে জড়ো করিয়া রাখে, প্রায় অপলক চোখে আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। দেয়ালে লটকানো বিদ্যুৎ আলো হইয়া আশালতার মুখে আসিয়া পড়িতে থাকে অবিরাম, মুখের এক পাশে থাকে মুখের ছায়া, নাকের পাশে থাকে নাকের ছায়া, আধ-ঢাকা চোখে থাকে চোখের পাতার ছায়া,—আলোছায়ায়

আশালতার মুখখানা অতি ভয়াবহ মনে হয়। অনুপম শিহরিয়া উঠে। সে যেন এক কান দিয়া আশালতার কথার মৃদু গুঞ্জন শুনিতে পায়, অপর কানটিতে সেই গুঞ্জনের সুর কাটিয়া কাটিয়া কে যেন বলিয়া চলে, এ তরঙ্গ নয়, এ তরঙ্গ নয়।

খানিক পরেই অনুপমকে ঘুমের ভাণ করিতে হইবে। আশালতা যে কথাই বলিয়া চলুক, অনুপম জানে, মনে মনে সে আবৃত্তি করিতেছে 'ঘুম-পাড়ানী মাসাপিসী ঘুম দিয়ে যা।' ঘুমের ভাণ না করিয়া তার উপায় কি! জোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া সে চোখ বুজিয়া থাকিবে, খানিক অপেক্ষা করিয়া আশালতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে, 'ঘুমোলে?'

সে সাড়া দিবে না।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আশালতা বালিশ ঠিক করিয়া সন্তর্পণে তার মাথাটি বালিশে নামাইয়া দিবে। আলো নিবাইয়া অধিকতর সন্তর্পণে পাশে শুইয়া পড়িবে।

অনুপমের মনে হইবে ষ্টেজের আলো নিবিয়া গেল।

অভিনয়-মঞ্চের আলো নেবে এবং জ্বলে, কিন্তু বক্তৃতামঞ্চে অনুপমের আনাগোনায় আশালতা যে যবনিকা টানিয়া দিল, তাহা আর উঠিল না। ব্রহ্মানন্দ একদিন অনুপমকে ডাকিতে আসিয়া মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ফিরিয়া গেল, আর একদিন ডাকিতে আসিয়া সে পড়িল আশালতার পাল্লায়।

'আপনাদের ও সব ছ্যাবলামিতে যোগ দেবার সময় আমারও নেই, ওঁরও নেই, ব্রহ্মানন্দ বাবু।'

'ছ্যাবলামি ! আপনি—আপনি—' বক্তব্যটা শক্ত জিনিষের মত ব্রহ্মানন্দের গলায় আটকাইয়া গেল।

'চা খাবেন ?'

চা না খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ বিদায় গ্রহণ করিল এবং কয়েকদিন পরে অনুপমের নামে একখানি বেনামী চিঠি আসিল। চিঠিতে 'দি ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরি-বডিজ্ রাইটস ইনক্লুডিং ষ্টুডেণ্টস্'-এর প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক সরসীলাল ভাদুড়ীর নামের সঙ্গে আশালতার নাম জড়াইয়া কয়েকটা কথা লেখা ছিল।

আশালতা বলিল, 'দেখি কার চিঠি ?'

আগাগোড়া চিঠিখানা পড়িয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

'উঃ, কি শয়তান ছেলে ! সেদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম কি না, তাই শোধ নিচ্ছে। কার হাতের লেখা জান ? ব্রহ্মানন্দের।'

অনুপমের মুখ গম্ভীর হইয়াছে দেখিয়াও সে নিজের হাল্কা পরিহাসের ভঙ্গী ত্যাগ করিল না, বলিল, 'কিগো, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাও, খোঁজ নিয়ে এস গে ?'

অনুপম বলিল, 'ধেৎ।'

আদর্শের হিসাবে জীবনের মূল্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতে-ছিল, কিন্তু জীবন যে এত সস্তা হইতে পারে কিছুদিন আগেও অনুপমের এ ধারণা ছিল না। তরঙ্গের আত্মহত্যার পর হইতে আদর্শের নামে যে অবাস্তব স্বপ্নের রঙীন প্রতিবিম্বগুলি জীবন

হইতে একটির পর একটি মুছিয়া যাইতেছিল, সেগুলির প্রতি অনুপমের মমতা বড় কম ছিল না। কেবল তার নিজের নয়, তার পরিচিত ভাল-মন্দ সকল মানুষের জীবন যে আদর্শের রঙে রঙান করা হইয়াছে, সেগুলির রঙ এত কাঁচা কেন যে, বাস্তব জীবনের সমান্য একটু স্পর্শ পাইবামাত্র রঙ উঠিয়া কুশ্রী হইয়া যায়, এতবড় একটা প্রশ্নের জবাব আবিষ্কার করিবার মত মাথা অনুপমের ছিল না, কিন্তু প্রশ্নটা একটা অস্পষ্ট রূপ ধরিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, প্রশ্নটার জবাব কি এই যে, মানুষের জীবনে আজ মনুষ্যত্ব শিথিল হইয়া গিয়াছে ?

তারপর একদিন সাধনা বলিলেন, 'অপরাধী সেজে থাকলে তো চলবে না অনু, কিছু করতে হবে। কি করবি ভেবেছিস ?'

অনুপম কি করিবে সে ভাবনা অনুপমের হইয়া আশালতা আগাগোড়া ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এবং অনুপমকেও প্রায় সেই ভাবেই ভাবিতে শিখাইয়া আনিয়াছিল। মনে মনে অনুপম জানে, আশালতা যাহা স্থির করিয়াছে, তাই তাকে শেষ পর্য্যন্ত করিতে হইবে, তবু সাধনাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবার সাহস তাহার হইল না।

'ভাবছি। এখনো কিছু ঠিক করি নি।'

'ঠিক তুই কোনদিন করতে পারবি না। তোর একটুও মনের জোর নেই অনু।'

বড় শ্রান্ত মনে হয় সাধনাকে, বড় অসহায় মনে হয়। মানুষটার গায়েও যেন এতটুকু জোর নাই, মনেও এতটুকু জোর নাই। জীবন-যুদ্ধে এতদিনে তিনি যেন একেবারে হার মানিয়াছেন,— যুদ্ধের শেষে যখন জয়গৌরব লাভ করিবার কথা ঠিক তখন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ধরিতে গেলে তিনি একরকম তপস্যা করিয়াছেন বৈ কি,—আত্মনির্ভর-শীলতার তপস্যা, স্বামীর ইচ্ছাপালনের তপস্যা, বীরেশ্বরের আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইবার প্রলোভন জয় করিবার তপস্যা। এমন ভাবে সাধনা অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন যে মনে হয়, অনুপমের দাম কষিয়া তিনি যেন ব্যাকুল ভাবে নিজের সুদীর্ঘ ও কঠোর ব্রতপালনের সার্থকতা যাচাই করিতেছেন, সবটাই যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কোনমতেই তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না :

'তুই যে কি করে এমন হয়ে গেলি অনু !'

অনুযোগের চেয়ে কথাটা আপশোষের মতই শোনায় বেশী। নিজেকেই যেন তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এত করলাম তবু ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারলাম না কেন ? কেন আমার এতদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ?

অনুপমের মন খারাপ হইয়া যায়। কেবল আশালতার জন্যই যে সাধনা হঠাৎ তাহাকে অমানুষ মনে করিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন স্পষ্ট ভাবে অনুপম তা জানে যে, অন্ধভাবে আশালতার পক্ষ সমর্থন করিয়া সাধনার উপর একটু বিরক্ত হইয়া

উঠিবার সুযোগটা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে না। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সে চলিয়া যায় নিজের ঘরে। দেখা যায় সেখানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে আশালতা।

'মা কি বলছিলেন ?'

'শিব গড়তে কেন বাঁদর গড়লেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।'

চোখের পলকে আশালতা বুঝিতে পারে, অনুপম রাগ করিয়াছে। কিন্তু কার উপর রাগ করিয়াছে বুঝিতে পারে না।

'মাকে বলেছ বুঝি ?'

'না। আমি বলতে পারব না।'

শুনিয়া আশালতা রাগ করে না, শিশুর অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় দিবার ভঙ্গীতে মৃদু একটু হাসিয়া বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তুমি ! একটুতে মন বিগড়ে যায়।'

সাধনা মনে করেন অপদার্থ, আশালতা মনে করে ছেলে—মানুষ। এদের কারও মনে করার সঙ্গে অনুপমের নিজের ধারণা মেলে না। নিজেকে তার মনে হয় একটা রূপ-ধরা ফাঁকি, যার মধ্যে অপদার্থতাও নাই, ছেলেমানুষীও নাই।

বীরেশ্বরের সঙ্গে আশালতার বার চারেক দেখা হইয়াছে। দুবার বীরেশ্বর এ বাড়ীতে আসিয়াছেন, দুবার সকলকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। বীরেশ্বরকে যতটুকু চেনা দরকার, চারবার দেখিয়াই আশালতা চিনিয়া ফেলিয়াছে, ও দিক দিয়া তার কোন ভয় নাই। তার ভয় শুধু সাধনাকে।

তবে অনুপমের কাছে সাধনার অদ্ভুত মনের জোর ও একগুঁয়েমির কাহিনী শুনিতে শুনিতে সাধনার সম্বন্ধে তার যে রকম ভয় হইয়াছিল, এখন সে ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে যে অবস্থায় মানুষ ভাঙ্গিয়া পড়ে, সাধনা সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সাধনাকে আরও খানিকটা নির্জ্জীব করিয়া আনিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের বেনামা চিঠির পর আর দেরী করিবার সাহস আশালতার হইল না।

একদিন বিকালের দিকে অনুপমকে সঙ্গে করিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। বাহির হইল একটু সকাল সকাল, কারণ অনেক কিছু করিবার ছিল। পথে পথে নামিয়া বলিল, 'পথে ঘাটে কোথায় বেড়াব? তার চেয়ে চল আমরা দু'একজন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখা করে আসি। অনেক দিন দেখা হয় নি, বিয়ের সময়ও নেমন্তন্ন করি নি—নিশ্চয় ভারি ক্ষুন্ন হয়ে আছে।'

'সিনেমায় গেলে হত না?'

'সিনেমায় আর একদিন যাব।'

যে দুটি বাড়ীতে যে দুটি পরিবারের মধ্যে আশালতা অনুপমকে টানিয়া লইয়া গেল, তাদের সঙ্গে আশালতার পরিচয় থাকা সম্ভব, বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। সে সম্পর্ক যে আছে, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। বরং আশালতার মত মেয়েকে এক দিন চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াই যে কৃতার্থ করিয়া

দেওয়া যায়, দুটি পরিবারের একজনেরও, এমন কি খানসামা বেয়ারাগুলির পর্য্যন্ত, এই জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব আছে বলিয়া মনে হইল না। আশালতা নিজেও আজ সাজগোজ করে নাই, অনুপমও করে নাই। নিজে স্বপ্ন-জীবনের এই দুটি প্রায়-অভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে নরম আসনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া মার্জ্জিত কণ্ঠের ভাসা-ভাসা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভদ্রতার আলাপ শুনিতে শুনিতে অনুপমের মনে হইতে লাগিল, সুদৃশ্য অ্যাশ-ট্রে পর্য্যন্ত যেন সস্ত্রীক অনুপমবাবুকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দু'নম্বর বাড়ীটির গেট পার হইয়া দু'পাশের সম্ভ্রান্ত বাড়ী-গুলির মধ্যে পিচ-ঢালা পরিচ্ছন্ন পথ ধরিয়া দু'জনে ট্রাম-লাইনের দিকে হাঁটিতে লাগিল।

আশালতা অনুপমের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, এক সময় মৃদুস্বরে বলিল, 'গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেবার কথা বলল,—ঠিক একটি বার! জানে যে প্রথমবার ভদ্রতা করে আমরাও বলব, গাড়ীর দরকার নেই। আর একবার যদি বলত, আমি ঠিক বলে বসতাম, এত করে যখন বলছেন, মেনি থ্যাঙ্কস্।'

অনুপম ঝাঁঝালো সুরে বলিল, 'হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে নাকি?'

'হাঁটতে আবার কি কষ্ট?—মজা করে খানিকক্ষণ দামী গাড়ীতে চড়ে নিতাম!'

'দামী গাড়ীতে চড়লেই মানুষ সুখী হয় না।'

আশালতা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা ঠিক। সুখী হওয়া অ্যাতো কঠিন!'

তারপর আরও খানিকক্ষণ রাশ আল্‌গা দিয়া সহরতলীর হ্রদের ধারে অনুপমকে একটা পাক খাওয়াইয়া এক সময় আশালতা আবার রাশ টানিয়া ধরিল এবং সন্ধ্যার পরেই অনুপমকে হাজির করিয়া দিল বীরেশ্বরের কাছে।

সমস্ত শুনিয়া বীরেশ্বর বলিলেন, 'এ বুদ্ধি তোকে কে দিল অনু?'

'কেউ বুদ্ধি দেয় নি, নিজের ফিউচার ঠিক করে নেবার বয়স আমার হয়েছে ঠাকুর্দ্দা।'

'কথা শুনে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। তোর বিলেত যাওয়ার মানে হয়, বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাবার তোর কি দরকার?'

এ প্রশ্নের জবাব আশালতা অনুপমকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল। মুখ কালো করিয়া সে বলিল, 'কারণ আছে। আপনাকে বলতে পারব না ঠাকুর্দ্দা।'

বীরেশ্বরও মুখ কালো করিয়া বলিলেন, 'আমার টাকায় দুজনে বিলেত যাবি, আমাকে বলতে পারবি না?'

অনুপম বলিল, 'না।'

বীরেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলেন। তারপর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ঠিক আমার টাকা নয়। তুই তোর বাবার টাকা দাবী করছিস, না অনু?—রাগ করে আমায় ত্যাগ না করলে শঙ্করের বাবার মত তোর বাবার জন্যে আমাকে যে

টাকাটা খরচ করতে হত সেই টাকাটা, না ? আমি না মরলে আমার যা-কিছু আছে, তার ভাগ পাবি না জানিস বলে তোর বাপের কাছে যে টাকাটা ধারি, তাই আদায় করতে এসেছিস, কেমন ?'

অনুপম ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'না ঠাকুর্দ্দা, না। সত্যি তা নয়, আপনার কাছে সাহায্য চাইছি।'

'তোর মার কথাটা ভেবেছিস অনু ?'

'মা অবশ্য একটু রাগ করবেন—'

'একটু রাগ নয়, হয় তো জীবনে তোদের মুখ দেখবেন না।'

'কিন্তু মার জন্যে আমার ফিউচারটা তো নষ্ট করতে পারি না—'

বীরেশ্বর হঠাৎ রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, 'নিজের মাকে বাদ দিয়ে মানুষের ফিউচার কি রে বাঁদর ? মার জন্য একদিন তোর বাবা আমার টাকার লোভ ত্যাগ করেছিল, সেই টাকার লোভে আজ তুই তোর মাকে ত্যাগ করছিস। বৌমা তোকে মানুষ করতে পারেন নি অনু।'

অনুপম তা জানে।

রাগটা কমিতে কিছু সময় লাগিল বীরেশ্বরের। তার পর ঠিক যেন সাধনার মত শ্রান্ত ও অসহায় ভাবে বলিলেন, 'চাইছিস যখন, টাকা আমি দেব অনু। না দিলেই বা বৌমার কি লাভ হবে, যে ভাবই হোক বৌমাকে তোরা মেরে ফেলবিই।'

বীরেশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া অনুপম বারান্দায় একটু দাঁড়াইল। রামলালের ঘর অন্ধকার, এখনও তিনি রেস্তোরাঁয়

রুগ্ন জীবনের দৈনন্দিন ঔষধের বোতল খালি করিয়া বাড়ী ফেরেন নাই। শঙ্করের ঘরও অন্ধকার। বাড়ীর মেয়েরা কেউ চলাফেরা করিতেছে, কেউ শিশুদের ঘুম পাড়াইতেছে, কেউ নভেল পড়িতেছে। ছেলেমেয়েরা করিতেছে স্কুল-কলেজের পড়া। সকলের জন্য রান্নাঘরে প্রস্তুত হইতেছে খাদ্য।

বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সীতা-পিসীমা আশালতাকে চুপি চুপি কি যেন বলিতেছেন। কে জানে তরঙ্গের জীবন-কাহিনী কি না! তরঙ্গ যে ঘরে গলায় দড়ি দিয়াছিল, বারান্দার ঐ প্রান্তেই সেই ঘরে উঠিয়া যাইবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সীতা-পিসীমার কথা শুনিতে শুনিতে আশালতার মাথার আঁচল খুলিয়া পড়িয়াছিল। তরঙ্গের মত চুল তাহার নাই, তবু কি কৌশলে যেন চুলগুলিকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া প্রায় তরঙ্গের মতই মস্ত একটা খোঁপা বাঁধিয়াছে। এতদূরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণ আলোকে পাশের দিক হইতে আশালতার মুখখানা দেখিয়া অনুপমের হঠাৎ মনে হয়, তার মুখের একধারে যেন তরঙ্গের মুখের মরণের বিবর্ণ বিসদৃশ মুখোসের একটা টুক্‌রা কে আঁটিয়া দিয়াছে।

আশালতার সঙ্গে বাড়ী ফিরিবার সময় আশালতার মুখ না দেখিবার জন্যই অনুপম জোর করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া সাধনার মুখের দিকেও অনুপম চাহিতে পারিল না, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। ভবিষ্যৎ জীবনকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিবে, আশালতার সঙ্গে সে বিষয়ে অনেক জল্পনা-

কল্পনা করিয়াছে ; আজ এই মাত্র আশালতার সেই পরিকল্পনা সফল করিবার সবচেয়ে দরকারী ব্যবস্থাটি সে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজই তাহার বেশী করিয়া মনে হইতেছে যে, সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনটা এত দিনে সে সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যহীন করিয়া দিল! এতদিন ছোট ছোট উদ্দেশ্যহীন কাজ করিয়া দিন কাটাইয়াছে, এইবার আড়ম্বরের সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যহীন কাজটা আরম্ভ করিবে এবং সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন করিয়া দিবে সাধনার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন। এতদিন অনুপমের মনের কোণে আত্ম-সান্ত্বনার প্রয়োজনে একটা আশা ছিল। সাধনা তাকে মানুষ করিতে পারে নাই, সে অমানুষ, কিন্তু হয় তো একদিন মানুষ হইতে পারিবে, সন্ধান পাইবে জীবনের উদ্দেশ্যের, খুঁজিয়া পাইবে পথ। তারপর যেদিন সে মানুষ হইতে পারিবে, সেদিন প্রমাণ হইবে, সাধনার জীবনটাও ব্যর্থ হইয়া যায় নাই।

আজ সেই যুক্তিহীন আশাও অনুপমের মনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

সাধনা রোয়াকে বসিয়াছিলেন। একা। ঠিকা-ঝি কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। রান্না শেষ করিয়া সাধনা শূন্য-গৃহ আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

'এত রাত হল যে অনু ?'

অনুপম কতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে আশালতা তাহা জানিত, তাকে শান্ত হইবার, ভাবিবার সময় না দিয়া আজই

সমস্ত ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলবিার জন্য অনুপমের হইয়া সে জবাব দিল, 'ও বাড়ীতে গিয়েছিলাম মা।'

আজ সাধনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা বা সাহস কিছুই অনুপমের ছিল না। ও বাড়ীতে তাহারা কেন গিয়াছিল সাধনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া এবং আশালতার দুটি একটি মন্তব্যের জের টানিতে গিয়া সব কথাই সে বলিয়া ফেলিল।

সাধনা মড়ার মত বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরদিন সকালে ছোট একটি বাক্স সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন দেশে। একা।

খানিক পরে সুরু হইল বীরেশ্বর ছাড়া ও বাড়ীর সকলের আবির্ভাব। একটু আভাস পাইয়া সকলে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে আসিয়াছে। বাপের টাকার ভাগটা অনুপম দাবী করিয়াছে এবং তাহার দাবী মঞ্জুর হইয়াছে শুনিয়া মুখ কালো করিয়া সকলে ফিরিয়া গেলেন। সীতা-পিসীমা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

শঙ্কর আসিল দুপুরবেলা।

আশালতাই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, শঙ্করকেও সে-ই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। অনুপম একটি কথা বলিল না।

শঙ্কর বলিল, 'এক গ্লাস জল দিন তো, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।'

আশালতা বলিল, 'সরবৎ খাবেন? আমি যে সরবৎ তৈরী করি—একেবারে অমৃতের মত!'

আশালতা অমৃতের মত সরবৎ তৈরী করিয়া আনিতে গেল এবং শঙ্কর ও অনুপম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল পরস্পরের মুখের দিকে।

শেষ